দিল্লীতে কৃষক সমাবেশ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

ফ্রান্সে শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ।

নভেম্বর'২০১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ সপ্তম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

ষষ্ঠ রাজ্য কাউন্সিল সভা

আক্রমণের মোকাবিলায় চাই ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা

শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই কর্মচারীর উপর রাজ্য প্রশাসনের দমন পীড়নের অবসান ঘটাতে লড়াইয়ের ময়দানেই ১৯৫৬ সালে

বিজয় শংকর সিংহ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জন্ম। সংগঠনের দীর্ঘ পথচলায় বারে বারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র কর্মচারী সমাজের লড়াই আন্দোলনের গতিপথকে রুদ্ধ করার। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটির লড়াকু নেতৃত্বের হার না মানা অকুতোভয় মানসিকতা এবং মতাদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা, সর্বোপরি আমাদের রাজ্যের সমগ্র কর্মচারীদের সংগঠনের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রাখার দৃঢ় সংকল্পের ফলস্বরূপ সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি দপ্তরে। ৭১-৭২-এর সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থার কালো দিন কোনো পরিস্থিতিতেই

বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ শাসকশ্রেণীর কাছে মাথা নত করেন নি। ৬১ জন কর্মচারী খুন হয়েছেন, ১৩ জন নেতৃত্ব বরখাস্ত হয়েছেন, বহু কর্মী নেতৃত্ব দূরদুরান্তে বদলী হয়েছেন কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে, নিজ দাবি রক্ষার্থে তথা শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শকে পাথেয় করে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই তার লক্ষ্যে অবিচল থেকেছে। যে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে উৎখাত করার ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বেতন কমিশন চাইতে গিয়ে মিলল গ্রেপ্তার আর বদলী

গত ২৯ নভেম্বর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দেওয়া হয়েছিল। বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও রূপায়ণ, সরকারী দপ্তরে লক্ষাধিক শূনপদ পূরণ এবং চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন — মূলত এই ৪টি দাবিকে সামনে রেখে ঐদিন রাজ্যের সর্বত্র, একেবারে ব্লক স্তর পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে নবান্নে অনুরূপ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য। কিন্তু টিফিন বিরতিতে শ্লোগান সাউটিং শুরু হতেই শাসক দলের সেবাদাস পুলিশবাহিনী রে রে করে তেড়ে আসে এবং উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে টেনে হিঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। পরবর্তীতে প্রায় ৪ ঘণ্টা তাঁদের শিবপুর থানায় আটক করে রেখে তারপরে মুক্তি দেওয়া হয়। পরের দিনই প্রতিহিংসামূলক বদলীর আদেশনামা প্রকাশ করে উক্ত নেতৃবৃন্দকে দূরবর্তী জেলায় বদলী করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল চাকুরি সংক্রান্ত নিয়মবিধিতে (ডব্লু বি এস আর) সংগঠন করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই ঘৃণ্য কার্যকলাপে লিপ্ত হল এ রাজ্যের সরকার। এই ঘটনায় রাজ্যের সর্বত্র কর্মচারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ৩০শে নভেম্বর পুনরায় গোটা রাজ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

এ শ্রীকুমার

গত ২৬-২৭ নভেম্বর, ২০১৮ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা কর্ণাটক রাজ্যের বেঙ্গালুরুর গান্ধিভবনে একটি হলে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অখিল কর্ণাটক স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এই সভা আয়োজনের দায়িত্বে ছিল।

প্রথম দিন ২৬ নভেম্বর ২০১৮ সভা শুরুর আগে ন্যাশনাল পেনশন স্কীম এবং চুক্তিপ্রথার ও আউট সোর্সিং কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতনের দাবি নিয়ে জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারের উদ্বোধন করেন ডঃ বারা গুরু রামচন্দ্রপ্পা এবং মহাদেরয়া সাথাপাটি। সুভাষ লাম্বা সহ অনেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার প্রতিবেদন পেশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক জাতীয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন দেশের আরএসএস-বিজেপি সরকার আরো গতির সাথে নয়া উদারনীতি প্রয়োগ করছে এবং আজ সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা আক্রান্ত। দেশের শ্রমজীবী মানুষ দিশাহারা। দেশে নোট বাতিল ও জিএসটি-র দাপটে মানুষ ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত হয়েছে। পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা নজিরবিহীনভাবে আক্রান্ত। রাজ্যে রাজ্যে শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন তীব্র হচ্ছে এবং ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পার্লামেন্ট অভিযান-এর কর্মসূচীর ব্যাপক সাফল্যের পরবর্তীতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কনভেনশন থেকে ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ সরভারতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করব। যখন ব্যাপক ঐক্য গড়ে উঠছে তখন সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি চলছে। দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা সহ শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে এই দুদিনের ধর্মঘট সর্বত্র সফল করতে উদ্যোগ নিতে হবে। আগামী দিনগুলিতে ধর্মঘটের সমর্থনে কর্মসূচীতে রাজ্যে রাজ্যে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া তিনি সাংগঠনিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন।

▶▶ সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান উপলক্ষে রানি রাসমণী এভিনিউতে অফিস ছুটির পর

কেন্দ্রীয় সমাবেশ

৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ ধর্মঘটে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবি সনদ

● বকেয়া ৫৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। ● ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। ● অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সর্বজনীন গণ-বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং খাদ্য দ্রব্যের বাজারে ফাটকাবাজি ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। ● সীমাহীন বেকারি রোধ করে সকলের জন্য কর্মসংস্থান করতে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ● সমস্ত মুখ্য শ্রম আইনগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করে শ্রমিকদের অধিকারে আইনানুগ মান্যতা দিতে হবে। মালিকদের কোনো রকম ছাড় দেয়া যাবে না। যে মালিক শ্রম আইন ভঙ্গ করবে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। ● সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। ● মূল্যসূচকের সাথে পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৮০০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক বেতন দিতে হবে। ● সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য ন্যূনতম প্রতি মাসে ৬০০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ● কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ এবং উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পিতভাবে শেয়ার বিক্রি বন্ধ করতে হবে। ● স্থায়ী এবং স্থায়ী ধরনের কাজে ঠিকা প্রথায় কাজ করানো বন্ধ করতে হবে এবং সমকাজে সমবেতনের ভিত্তিতে সকল ঠিকা শ্রমিককে স্থায়ী কর্মীদের সমান মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে। ● বোনাস, ই এস আই, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের যোগ্যতাসীমা প্রত্যাহার করতে হবে। গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ● আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে। আই এল ও কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮ ভারত সরকারকে মান্যতা দিতে হবে। ● শ্রম আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকের অধিকার হরণ করে মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা প্রচলনের চক্রান্ত বন্ধ কর। ● রেল, বীমা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ কর।

সম্পাদকীয়

আসন্ন ধর্মঘট ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা

আগামী ৮-৯ জানুয়ারি ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে যে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই ধর্মঘটে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার সহযোগী আরও তিনটি সংগঠনের যৌথ আহ্বানে এ রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও শামিল হবেন। সদ্য অনুষ্ঠিত সংগঠনের ষষ্ঠ কাউন্সিল সভা থেকে এই মর্মে সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। ধর্মঘটের প্রচার প্রস্তুতির কাজও শুরু হয়ে গেছে জোর কদমে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতে আহুত সাধারণ ধর্মঘটকে সক্রিয় সমর্থন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বা এ রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কোন নতুন বিষয় নয়। বরং এটাই ঐতিহ্য, খুব বেশী পুরোনো তথ্য না ঘেঁটেও, যদি সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের একেবারে গোড়ার দিক থেকে শুরু করে, বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের বিরুদ্ধে আহুত প্রতিটি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা শামিল হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত এমন ধর্মঘটের সংখ্যা খুব কম নয় — ১৭টি।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন কেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজ্য সরকারী সরকারী কর্মচারীদের ঐ ধর্মঘটগুলিতে শামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল? আচ্ছা, ঐ ধর্মঘটগুলিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া বলতে যা বোঝায় তা কিছু ছিল কি? নাকি, স্রেফ রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল বা হয়? অথবা ধর্মঘট করে কি আদৌ কোন লাভ হয়? — এই প্রশ্নগুচ্ছের জবাব দেওয়ার দায় নিশ্চিতভাবেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রয়েছে। বিশেষ করে এই সময়ে এই দায়তো আরও বেশী। কারণ যতদিন যাচ্ছে, ততই যেন ধর্মঘট মানে সর্বনাশা, কর্মনাশা ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচার করে, এর গুরুত্বকে লঘু করার প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বিপুল ভেদশক্তি সম্পন্ন কর্পোরেট মিডিয়াতো ধর্মঘট শুনলেই, একেবারে আদাজল খেয়ে বিরোধীতায় নেমে পড়ে। অবশ্য মিডিয়ার এই ভূমিকায় আমরা আদৌ বিস্মিত নই। কারণ একদিনের ধর্মঘট মানে, গোটা একদিন সমস্ত ধরনের পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন বন্ধ এবং যার অর্থ কর্পোরেট পুঁজি ও লগ্নীপুঁজির মুনাফায় টান। মুনাফা হচ্ছে পুঁজির জীবনীশক্তি। তাই মুনাফায় টান পড়ার সম্ভাবনা দেখলেই (ধর্মঘটের ঘোষণা শুনলে) পুঁজি তার পোষ্য মিডিয়াকে নির্দেশ পাঠায়, ধর্মঘট বিরোধী সুতীব্র প্রচার শুরু করার জন্য। তাই মিডিয়ার ভূমিকা আমাদের বিস্মিত করে না। আবার কোন কোন মিডিয়া হাউস বা গোষ্ঠী কচিৎ-কদাচিৎ তার গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা স্মরণ করে কিছুটা নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করলেই, রাজশক্তির বহুবিধ আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্বভাবতই বাণিজ্যিক স্বার্থকে উপেক্ষা করার ঝুঁকি কেউই নিতে চায় না। এক কথায়, গণতন্ত্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' হিসেবে যে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা পালন করার কথা, সেই সংবাদ মাধ্যম এখন (নয়া উদারবাদী অর্থনীতির জমানায়) কর্পোরেট পুঁজি ও আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির সেবাদাসের ভূমিকা পালনে বিশেষভাবে সক্রিয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ব্যক্তি মালিকানাধীন মিডিয়া গোষ্ঠীগুলি একযোগে জনমানব শূন্য পর্বতশৃঙ্গ, মাঝ সমুদ্র অথবা বনে জঙ্গলে তাদের চোখ ধাঁধানো প্রচারের জাল বিস্তার করে না। তারা এটা করে জনসমাজের অভ্যন্তরে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে এবং এই প্রচারের কৌশলগত বিভিন্নতা থাকলেও অভিমুখ কিন্তু একটাই—সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সমস্যার মূল কারণগুলিকে যতটা সম্ভব আড়াল করে রাখা। তাইতো আমরা দেখি শিল্পের দাবিতে সিঙ্গুর থেকে কলকাতা পদযাত্রার সংবাদের থেকে অনেকবেশি গুরুত্ব পায় রাজ্যের শাসকদলের কোন এক নেতার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সরকার ও তাঁর দলের অভ্যন্তরে চাপান উতোরের সংবাদ। ধর্মঘট কেন্দ্রীক নেতিবাচক প্রচার, ধর্মঘটের গুরুত্বকে লঘু করে দেওয়া বা ধর্মঘট মানুষের স্বার্থবিরোধী ইত্যাদি বক্তব্য সাধারণ মানুষ কাছে গ্রহণযোগ্য করার লাগাতার প্রচেষ্টা চলেই। কৌশলী মিডিয়া শ্রমজীবী মানুষের কাছে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনের জন্য কখনও কখনও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে থেকেই প্রচারের উপাদান সংগ্রহ করে। যেমন, একদিন বা দু'দিনের ধর্মঘট মানে দিন আনি, দিন খাই মানুষের রুটি রুজি বন্ধ। অথচ যে নীতির কারণে 'দিন আনি দিন খাই' মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে নীতির কারণে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইন বলবৎ করা হচ্ছে না, সেই নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা মিডিয়া বলতে নারাজ। অথচ সেই নীতিগুলির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘট ডাকলেই মিডিয়া রে রে করে প্রচারে নেমে পড়ে।

মিডিয়ার এই সর্বগ্রাসী প্রচারকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কারণ মধ্যবিত্ত মানুষ আর মিডিয়া এখন 'Kitn and Kin' সম্পর্কে লিপ্ত। জীবনের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে মিডিয়া প্রদর্শিত মাপকাঠির ভিত্তিতেই মানুষ (বিশেষত মধ্যবিত্ত) ভাল মন্দ বিচার করুক, মিডিয়া ও তাদের মালিক গোষ্ঠী এটাই চায়। নোয়াম চমস্কি যাকে বলেছেন 'কনসেন্ট ম্যানুফ্যাকচার করা। তাই ধর্মঘট বিরোধী বহুমাত্রিক প্রচারও (প্রচারের হেজিমনি, সৌজন্যে গ্রামসি) ধর্মঘট বিরোধী 'কনসেন্ট' ম্যানুফ্যাকচার করার কৌশলী উদ্যোগ ব্যতীত কিছু নয়। তাই শুরুতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমত ধর্মঘট একটি কালোত্তীর্ণ প্রক্রিয়া, আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সূচনা পর্ব থেকেই যার ব্যবহার হয়েছে, হয়ে চলেছে বারবার। শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ঐতিহাসিক মে দিবসের লড়াই শুরু হয়েছিল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশেও স্বয়ং গান্ধীজী তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেরও সূচনা করেছিলেন শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমেই। তাই ধর্মঘট মানেই বামপন্থীদের কারসাজি একথা আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু পাশাপাশি একথা অতি অবশ্যই ঠিক যে আমাদের দেশ সহ বিশ্বের দেশে দেশে, যে সমস্ত ধর্মঘট সংগঠিত হয়, তার অধিকাংশরই নেতৃত্বে থাকে বামপন্থীরা অথবা বামপন্থীরাই হয় প্রধান উদ্যোক্তা। এর কারণটাও খুব স্পষ্ট। বামপন্থীরাই প্রকৃত অর্থে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে অথবা এভাবেও বলা চলে, শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত সুহৃদ হওয়ার পথই হল বামপন্থা।

এবারে আমরা আসতে পারি দ্বিতীয় প্রশ্নে। ধর্মঘট না করলে কি চলে না? বা, ধর্মঘট করে কি আদৌ কোন লাভ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা একটা পাল্টা প্রশ্ন করতে পারি। আচ্ছা শ্রমজীবী মানুষ কি প্রতিদিনই ধর্মঘট করছেন? ধরুন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় রয়েছেন, থাকবেন ৩৬৫ × ৫ =১৮২৫ দিন। এর মধ্যে ধর্মঘট হয়েছে এবং হবে (২০১৫ সালে একদিন, ২০১৬ সালে ১ দিন এবং ২০১৯ এ ৮-৯ জানুয়ারি অর্থাৎ ২ দিন) মোট ৪ দিন। অর্থাৎ ১৮২১ দিন কোন ধর্মঘট হয়নি বা হবে না।

তার মানে শ্রমজীবী মানুষের দাবিগুলিকে বিবেচনা করার, তার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখানোর বহু সময় সরকারের হাতে ছিল। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা করা ইত্যাদি কোন দাবিকেই কি অসঙ্গত বলা যাবে? এমনকি মিডিয়াও এই দাবিগুলিকে অসঙ্গত বা অন্যায্য বলতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকার যদি দাবিগুলির ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হত, তা পরেও কি শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটে যেতেন? যেতেন না। কারণ ধর্মঘট শ্রমজীবীদের ' ফ্যাশন' নয়, পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা।

তৃতীয়ত, ধর্মঘট ও রাজনীতি। ধর্মঘট একটি রাজনৈতিক সংগ্রামতো বটেই। কারণ যে নীতির কারণে শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা আক্রান্ত নয়, সেই নীতি পরিবর্তনের দাবিইতো উত্থাপিত হয় ধর্মঘটে। অবশ্য বর্তমান সময়ে মিডিয়া রাজনীতির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার সাথে ধর্মঘটের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ মিডিয়া নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনীতি হল, কিছু ব্যক্তি কেন্দ্রীক রাজনৈতিক দলের মল্লযুদ্ধের আসর। যেখানে নীতির প্রশ্নটিই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কে কাকে কুপোকাৎ করে ক্ষমতায় বসবে, এনিয়ে যতই রসালো চর্চা মিডিয়া করুক, শ্রমজীবী মানুষ বোঝে বা বোঝা দরকার মুখ বদলালেই নীতি বদলায় না। মুখের সাথে সাথে নীতি ও বদলানো প্রয়োজন। তাই নীতি বদলানোর ডাক দেওয়া ধর্মঘট রাজনৈতিক লড়াইতো বটেই। তবে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি নয়।

ধর্মঘট ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রসঙ্গ। এটা ঠিক যে এবারের ধর্মঘট সর্বভারতীয় দাবি সনদের সাথে আমরা নিজস্ব কয়েকটি জরুরী দাবিকে (যেমন মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন ইত্যাদি) যুক্ত করে অংশগ্রহণ করব। ২০১৫-২০১৬-র ধর্মঘটেও আমরা তাই করেছিলাম। কিন্তু ১৯৯১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৫টি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে কিন্তু আমরা নিজস্ব কোন দাবিকে যুক্ত না করেই ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলাম। এর মধ্যে ২০১১ পর্যন্ত রাজ্যে ছিল বামফ্রন্ট সরকার। কোন ধরনেরই আর্থিক বঞ্চনা আমাদের ছিল না। ২০১২ আর ২০১৩-র ধর্মঘটের ঠিক আগে রাজ্যে সবেমাত্র সরকার পরিবর্তন হয়েছিল। বঞ্চনাও শুরু হয়েছিল সেই সময়েই। কিন্তু নতুন সরকার, আমাদের মনে হয়েছিল আরও কিছুদিন দেখা দরকার। তাই ২০১২ ও ২০১৩- ধর্মঘটেও নিজস্ব দাবিকে সর্বভারতীয় দাবি সনদে যুক্ত করিনি। কিন্তু সর্বভারতীয় দাবিগুলিকে সমর্থন করে ধর্মঘট আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। কারণ ধর্মঘটের সর্বভারতীয় দাবিগুলিও আমাদের দাবি। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার দাবি আমাদেরও দাবি। বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিও আমাদের দাবি। কারণ এর সাথে আমাদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত সুরক্ষার প্রশ্নটি জড়িত। ফলে আমাদের পেশাগত ক্ষেত্রে কোন আর্থিক বঞ্চনা না থাকলেও আমরা ধর্মঘট করতামই।

তবে ইতোমধ্যে আমাদের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনা বা প্রতারনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং ধর্মঘট ব্যতিরেকে বাকি সমস্ত গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু যতদিন যাচ্ছে ততই আক্রমণ, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য ক্রমশ বাড়ছে। যে কর্মচারীরা প্রশাসনকে সচল রেখেছেন, সেই কর্মচারীদের অস্তিত্বকেই যেন সরকার স্বীকার করতে চাইছে না। এমনকি, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কর্মচারীদের সম্পর্কে অপমানজনক কটু মন্তব্য করছেন। এমতাবস্থায় ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই রাজ্য সরকারের প্রতারনার জবাব দিতে হবে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে ধর্মঘট দ্বি-মুখী। একদিকে যেমন তা মোদী সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, অপরদিকে তা চলনে-বলনে, কাজে কর্মে মোদী সরকারেই প্রতিচ্ছবি এই রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধেও। তাই আসুন, রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই ধর্মঘটের পথে, নয়া ইতিহাস লেখার তাগিদে। □ **১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮**

শোক সংবাদ

প্রবীর দাশগুপ্ত

পুরুলিয়া জেলা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পুরুলিয়া জেলার প্রাক্তন সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সহসভাপতি, ১২ জুলাই কমিটির প্রবীণ নেতৃত্ব কমরেড প্রবীর দাশগুপ্ত গত ২৬ নভেম্বর ২০১৮ দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। প্রয়াত কমরেড প্রবীর দাশগুপ্ত ষাটের দশক থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পতাকাতলে জেলার কর্মচারী সমাজকে সংগঠিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বামপন্থী নীতি আদর্শের প্রতি আমৃত্যু তাঁর অবিচল আস্থা জেলার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকদের নেতা হিসেবে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর সদালাপী আন্তরিক ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করতো। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পরের দিন পুরুলিয়া জেলায় তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য ও জেলার শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ পুরুলিয়া জেলার কর্মচারী ভবনে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে। □

উৎপল কুমার সেনগুপ্ত

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'- এর সম্পাদকমণ্ডলীর, পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের একজিকিউটিভ কমিটির এবং এই সংগঠনের মুখপত্র 'লালদীঘি'র সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য উৎপল কুমার সেনগুপ্তের বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে জীবনাবসান হয়েছে গত ৯ সেপ্টেম্বর '১৮, সকাল ৫টা ৫ মিনিটে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, দুই ভাই-বোন সহ অন্যান্য পরিজন এবং গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের।

কলকাতার বিবেকানন্দ রোড (মানিকতলা) সন্নিহিত বাসগৃহে উৎপল কুমার সেনগুপ্তের জন্ম ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ সালে। পিতা শচীন্দ্রমোহন ও মাতা প্রতিভাদেবীর চার পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

ক্যালকাটা একাডেমী, বঙ্গবাসী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবন শেষে তিনি প্রাচীন ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের রাইটার্স বিল্ডিংসে অবস্থিত আর্কাইভস দপ্তরে (শিক্ষা লেখ্যাগারে) অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কাইভিস্ট হিসাবে ২৭ জুন, ১৯৫৫ সালে। নথি, দলিল-দস্তাবেজ, গ্রন্থাদি সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার কর্মকাণ্ডে স্বল্পকালের মধ্যেই আকৃষ্ট হয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং এই বৃত্তিতে একজন বিশেষজ্ঞের মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। ১৯৯১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চিফ্ আর্কাইভিস্ট পদাধিকারী রূপে অবসর গ্রহণ করেন।

চাকুরী জীবনের শুরুর কাল থেকেই তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। দীর্ঘদিন ঐ সংগঠনের এক্‌জিকিউটিভ কমিটির সদস্য রূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। সত্তর দশকের দুঃসময়ের কালে (১৯৭০-৭৭) এই সংগঠনের মুখপত্র 'লালদীঘি'র সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে ১৯৭৯ থেকে ২০০৭, দীর্ঘ আঠাশ বছর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর বরিষ্ঠ সদস্যরূপে পত্রিকার মানোন্নয়ন ও বিকাশে তিনি সক্রিয় অবদান রেখেছেন। তাঁর এডিটিং (সম্পাদনা) ও বর্ণশুদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল প্রশ্নাতীত। এই পত্রিকার পাতায় তাঁর লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও 'দিলদার' ছদ্মনামে লিখিত রস রচনাগুলি ছিল সংযত, নিটোল ও অন্তর্বস্তু সমৃদ্ধ। বহু জটিল বিষয়ের সংকলনে তাঁর নেতৃত্ব ছিল অপরিহার্য। তাঁর নৈপুণ্যের অন্যতম সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর নেতৃত্বে সংকলিত "লালদীঘি ঃ তিন দশক" গ্রন্থটি।

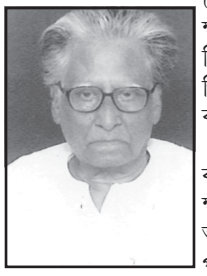

সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর সবিশেষ অনুরাগ। অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রাণের আরাম। তিনি উত্তর কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ ও প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় এই সংগঠনটি ছিল অগ্রপথিক। সোসাইটির মুখপত্র 'চিত্রভাষ"-এর সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। তাঁর চারু ও কারুকলায় আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে সংগঠনের বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে পোস্টার-প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সাংগঠনিক নেতৃত্ব প্রদানে। পরিচালনা করেছেন পোস্টার-ওয়ার্কশপও। রাইটার্স বিল্ডিংস ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি তাঁর অবদান রেখে গেছেন।

উৎপল সেনগুপ্ত চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। আদ্যন্ত নিপাট, শ্বেত-শুভ্র, ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত। মৃদু ও স্বল্পবাক্ কিন্তু স্পষ্টভাষী শ্রীসেনগুপ্ত যেটা সঠিক মনে করতেন তা প্রকাশে ছিলেন অকুণ্ঠ। অপ্রিয় হতে পারেন জেনেও মতামত প্রকাশে কখনো পশ্চাদ্‌পদ হননি। তরুণতর প্রজন্মের সহকর্মীদের সঙ্গে মিশতে পারতেন অনায়াসে। তিনি ছিলেন তাঁদের বন্ধু ও অভিভাবক।

ব্যক্তিজীবনে বারংবার প্রিয়জনের অকাল বিয়োগ যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন কিন্তু ভেঙে পড়েননি। স্ত্রী সন্ধ্যা সেনগুপ্তের অকাল প্রয়াণের ক্ষত বুকে নিয়েই একমাত্র শিশুপুত্র চঞ্চলকে মাতা ও পিতার উভয়ত পরিচর্যা দিয়ে বড় করে তুলেছেন।

শেষ জীবনে গ্লুকোমার কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর হতে থাকায় আজীবন লালিত পাঠাভ্যাসে প্রতিবন্ধকতা, তাঁর দারুণ মর্মবেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। অপর মর্মবেদনার কারণ হয়েছিল, তাঁর অবলম্বন একমাত্র পুত্রের সুন্দরবন এলাকার দূরতর প্রান্তে কর্মজীবনজনিত বিচ্ছেদ। উভয় মর্মবেদনাই তাঁকে বহির্জগৎ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। এই নিঃসঙ্গ জীবনের শেষপ্রান্তে আংশিক উপশম ঘটে, পুত্রের বিবাহের পর পুত্রবধূ উপমা ও পরবর্তীকালে দৌহিত্র উজানের সান্নিধ্যে।

আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী উৎপল কুমার সেনগুপ্তের বর্ণময় স্মৃতির উদ্দেশে জ্ঞাপন করছি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি তাঁর শোকস্তব্ধ পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র সহ অপরাপর পরিজনদের। উৎপল কুমার সেনগুপ্ত তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলব না। □

প্রমথেশ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A)-এর মুখপত্র সমন্বয় পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সদস্য এবং উভয় সমিতিরই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী নেতা কমরেড প্রমথেশ মজুমদার দীর্ঘকালীন অসুস্থতার পর গত ১১ই অক্টোবর, ২০১৮ তাঁর বাস ভবনেই প্রয়াত হয়েছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

কমরেড প্রমথেশ চন্দ্র মজুমদার কর্মচারী সমাজে প্রমথেশ মজুমদার হিসেবেই পরিচিত নাম, তিনি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ১৯৩৭ সালে ২৯ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র মজুমদার। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঢাকুরিয়া উদ্বাস্তু বাপুজী কলোনীতে চলে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হন, কলকাতা ফ্রি স্কুল স্ট্রীট-এ বর্তমানে খাদ্য ভবনের অভ্যন্তরে সেচ দপ্তরের অধীনে রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কর্মজীবন শুরু আর এখান থেকেই ১৯৯৬ সালে চাকরি জীবন থেকে অবসর নেন। সরকারী কর্মচারী আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ফলে ৭২-এর সন্ত্রাসের সময় আক্রমণের শিকার হন এবং তাঁকে এলাকাচ্যুত হতে হয়। এইসময় প্রায় আড়াই দশক ধরে সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের মুখপত্র সমন্বয় পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিপালন করেন। তৎকালীন সময়ে শাসকের বিরুদ্ধে সমিতির আন্দোলনের রূপরেখা এবং মুখপত্র সমন্বয় পত্রিকাকে দক্ষতার সাথে কর্মচারী সমাজে জনপ্রিয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে শাদর সমন্বয় পত্রিকাতে তিনি নাট্যকারের ভূমিকায় বহু নাটক প্রকাশ করেন। সুমন ঘরে ফেরেনি, দুলো বাগচি ইত্যাদি নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য।

কমরেড প্রমথেশ মজুমদার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সাথেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। প্রমথেশ মজুমদার অত্যন্ত সাধাসিধে ও রসিক মানুষ ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র কর্মচারী আন্দোলনে নেতা ছিলেন না, নাট্যজগতে শিবশর্মা নামে অতি পরিচিত নাম। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভিন্ন পথসভায় ২০১৮ পর্যন্ত করেমড প্রমথেশ মজুমদার লিখিত পথনাটক পরিবেশিত হয়েছে। প্রমথেশ মজুমদার শেষজীবন পর্যন্ত সরকারী পেনশনার্স সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এ তিনি নাটক বা বিভিন্ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দিতেন। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে পুরস্কৃত হন। নাট্য জগতে তিনি শিব শর্মা নামে পরিচিত। ওঁনার রচিত ছোট বড়ো নাটক প্রকাশিত হয়েছে। 'কাশীনাথের জন্মান্তর' তাঁর প্রথম নাটক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির যৌথ উদ্যোগে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। আমৃত্যু দায়বদ্ধ, সংগঠনের একজন নির্ভীক সেনানী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুসারী কমরেড প্রমথেশ মজুমদার-এর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি ঐ সভায় বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। □

রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বভারতীয় সংগঠনের পত্র

No. 63/AISGEF/HQ Dated, 3rd December, 2018.
To
The Hon'ble Chief Minister,
Government of West Bengal,
Nabanna (14th Floor),
325, Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah-711102.
E-Mail: cm@wb.gov.in, cm@wb.nic.in

Sub : West Bengal State Government Employees –Arrears of Dearness Allowance and Implementation of Pay Revision – Requested.

Respected Madam,

I take leave to present before you on behalf of the West Bengal State Government employees the following pressing issues for your urgent intervention and settlement: Implementation of the VI Pay Commission is much delayed; the employees are yet to get many instalments of Dearness Allowance.

The employees organised demonstrations and resorted to slogan shouting in protest during lunch hour on 29th November, 2018. They were arrested by Police and are being proceeded against. Not only that, within a day or two after that incident of police arrest, the arrestees were transfered to distant places. I hope you understand the fact that the employees were exercising their democratic rights.

So those transfer orders need to be revoked. Most states have already released Dearness Allowance on a par with the Union Government's rates and also, implemented VI Pay Revision. The position being such, I request your goodself to review the punitive measures being contemplated against the employees and to issue early orders granting them the pending instalments of Dearness Allowances and implementation of VI Pay Revision.

Thanking you,

Yours faithfully,

A SREEKUMAR
General Secretary

রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সংগঠনের পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৯৪/১৮ তারিখ ঃ ০৩/১২/১৮
মাননীয়
মুখ্যসচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

মহাশয়,

আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ সরকারী কর্মচারীদের নিয়মবিধি (WBSR) অনুযায়ী নবান্নে টিফিন বিরতিতে কর্মচারীদের জরুরী কয়েকটি দাবির সমর্থনে শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে আমাদের সংগঠনের ১৮ জন নেতৃত্বকে পুলিশ হিংস্র অমানবিক আচরণ করে গ্রেপ্তার করে। ৩০ নভেম্বর, ২০১৮, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঐ ১৮ জনের মধ্যে ৮ জনকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে দূরদরান্তে বদলী এবং stands released করা হয়েছে। জানা গিয়েছে বাকি নেতৃত্বের বদলীর আদেশনামা প্রকাশের অপেক্ষায়।

আমরা সরকারের এই ঘৃণ্য অমানবিক আচরণের জন্য তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।

একই সাথে বদলী হওয়া সমগ্র নেতৃত্ব কর্মচারীদের তাঁদের চাকুরির পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়

বিজয় শংকর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক

জনগণের ওপর করের বোঝা

২০১৩-১৪ সালে অর্থাৎ ইউ পি এ-২ সরকারের শেষ বছরে মোট কেন্দ্রীয় পরোক্ষ করের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪-১৫ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ১২৮ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৩ কোটি টাকা। এবং ২০১৬-১৭ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৮১ হাজার কোটি টাকা। অথচ এই সময়কালে কর্পোরেট ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকা থেকে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯২৪ কোটি টাকায়। □

লিখিত প্রতিবাদ জানালেন বিধানসভার বাম পরিষদীয় দলনেতা

মাননীয়া শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারিখ ঃ ০৩.১২.২০১৮
নবান্ন, হাওড়া
মহাশয়া,

সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের মত প্রকাশ, ভিন্নমত এবং তদনুযায়ী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজ্যে আক্রমণ, অত্যাচার এবং দমন-পীড়ন যেভাবে বাড়ছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের। আশা করি আপনি সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রায় প্রকাশ, ৫৬ শতাংশ বকেয়া মহার্য ভাতা প্রদান সহ বিভিন্ন ন্যায্য দাবিতে সরকারি, আধা সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীসহ বিভিন্ন অংশের মানুষ তাদের ন্যায্য দাবির যে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন তা যথার্থ এবং সঙ্গত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে দমন-পীড়ন হচ্ছে তা সুস্থ এবং সভ্য সমাজে কাঙ্খিত নয়। প্রসঙ্গত, অতীতে আপনি এসমস্ত প্রসঙ্গে যা যা বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তার সম্পূর্ণ উল্টোপথেই আপনার নেতৃত্বে সরকার চলছে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। অতি সম্প্রতি বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন ইত্যাদি বিষয়ে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা নিয়ম বিধি অনুযায়ী টিফিন বিরতির সময়ে যখন তাদের দাবি জানাচ্ছিলেন, তখন রাজ্য সচিবালয়ে তাদের যে ভাবে নিগ্রহ, আক্রমণ এবং গ্রেফতার করা হয়েছে তা এককথায় অমানবিক এবং নজিরবিহীন।

এই ঘটনায় আক্রান্তদের প্রত্যেকেই যেভাবে তাৎক্ষণিক বদলির ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সরকারের দূরভিসন্ধি এবং প্রতিহিংসামূলক মনোভাবকেই স্পষ্ট করেছে। কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এহেন যুদ্ধ ঘোষণা সরকারের শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী চেহারাকেই স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

কর্মচারী অথবা মানুষের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি , ভয়-ভীতি প্রদর্শন, প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মনোভাব একটি অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী পথ। বরং আলাপ-আলোচনা এবং ন্যায্য দাবি গ্রহণ করার মনোভাবে চলাটাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে সরকার বিপজ্জনক পথেই হাঁটছে। এটা পরিহার করা এবং প্রতিহিংসার মনোভাব বন্ধকরা যে কোন সরকারের পক্ষেই জরুরি।

আশা করি বুঝবেন এবং দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

ধন্যবাদান্তে

(সুজন চক্রবর্তী)

অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধির ঢক্কানিনাদ ও বাস্তবতা
সারণি—১

সরকার	বছর	গ্রোথ রেট %	গড়
১ এনডিএ সরকার।	১৯৯৮-৯৯	৬.৪৯	
বাজপেয়ীর জমানা	'৯৮-৯৯	৭.২১	
	২০০০-০১	৩.৯৩	
	'০১-০২	৫.২৬	৫.৮১
	'০২-০৩	৩.৭৮	
	'০৩-০৪	৮.২২	
ইউপিএ-১	'০৪-০৫	৭.৪৭	
	'০৫-০৬	৯.৮৩	
	'০৬-০৭	১০.০৮	৮.৪
	'০৭-০৮	৯.৭৯	
	'০৮-০৯	৭.১৬	
ইউপিএ-২	'০৯-১০	৮.৯৯	
	'১০-১১	৯.৪২	৭.৭
	'১১-১২	৭.০৫	
	'১২-১৩	৫.৪২	
	'১৩-১৪	৬.০৫	
এনডিএ মোদীর	'১৪-১৫	৭.২	
জমানা	'১৫-১৬	৮.১	৭.৩
	'১৬-১৭	৭.১	
	'১৭-১৮	৬.৫	

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ

তেলের ওপর চাপানো কেন্দ্রীয় কর (প্রতি টাকা/লিটার)
সারণি—৪

	পেট্রোল	ডিজেল
মূল কাস্টম ডিউটি	২.৫০	২.৫০
বিশেষ কাস্টম ডিউটি	৪.৪৮+৭.০০ SAD	৬.৩৩+১.০০ SAD
অতিরিক্ত কাস্টম ডিউটি	৮.০০	৮.০০
মূল এক্সাইজ ডিউটি	৪.৪৮	৬.৩৩
বিশেষ এক্সাইজ ডিউটি	৭.০০	১.০০
অতিরিক্ত এক্সাজি ডিউটি	৮.০০	৮.০০
মোট—	৪১.৪৬	৩৩.১৬

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি/৯৫/১৮ তারিখঃ ০৩/১২/১৮
মাননীয়া
মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

মাননীয়া,

আপনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ২০১১ সালে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরে মহাকরণে সকল সংগঠনের উপস্থিতিতে বলেছিলেন ''আপনারা নির্ভয়ে সংগঠন করবেন।'' অথচ, বিগত ২৯ নভেম্বর, ২০১৮, কর্মচারী সমাজের কিছু ন্যায্য দাবি নিয়ে নবান্নে শান্তিপূর্ণভাবে শুধুমাত্র শ্লোগান দেওয়ার অপরাধে আপনার পুলিশ আমাদের সংগঠনের ১৮ জন নেতৃত্বকে হিংস্র আচরণ করে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে ৩০ নভেম্বর, ২০১৮, ১৮ জনের মধ্যে আপাতত ৮ জন নেতৃত্বের অনৈতিকভাবে দূরদূরান্তে বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে বাকিদের আদেশনামা প্রকাশের অপেক্ষায়।

এই আদেশনামা আপনার প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী।

এমতাবস্থায়, আমি সমগ্র বদলী হওয়া কর্মচারী নেতৃত্বকে তাঁদের পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়

বিজয় শংকর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি। কিন্তু বাস্তবে যা হয়েছে

বছর জিডিপি বৃদ্ধির হার (%) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার (%)
সারণি—২

১৯৭২-৭৭	৪.৬	২.৬
১৯৭৭-৮২	৩.৯	২.১
১৯৮২-৮৬	৪.০	১.৭
১৯৮৬-৯৩	৫.৬	২.৪
১৯৯৩-৯৯	৬.৮	১.০
১৯৯৯-২০০৪	৫.৭	২.৮
২০০৪-২০০৯	৮.৭	০.১
২০১১-২০১৫	৬.৮	০.৬

সারণি—৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেকারীর হারের বৃদ্ধি (%) ২০১১-১২	২০১৫-১৬
অষ্টম শ্রেণি	০.৬	২.৪
দশম শ্রেণি	১.৩	৩.২
দ্বাদশ শ্রেণি	২.০	৪.৪
স্নাতক	৪.১	৮.৪
স্নাতকোত্তর (PG)	৫.৩	৮.৫
স্নাতকম (টেকনিকাল)	৬.৯	১১.০
স্নাতকোত্তর (টেকনিকাল)	৫.৭	৭.৭
ভোকেশনাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	৪.৯	৭.৯

ডব্লু বি এম ও এ

সংগঠনের শতবর্ষে রক্তদান, দেহদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির (ডব্লু বি এম ও এ) শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানের কর্মসূচী পালিত হয় গত ৬ ডিসেম্বর। এদিন নব মহাকরণের ক্যান্টিন হলে এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অশোক সেনগুপ্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। এদিন বক্তব্য রাখেন শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ড. সুবিমল সেন। তিনি বলেন, রক্তদান করে কর্মচারীরা এই বার্তা দিচ্ছেন যে, শুধুমাত্র দাবি আদায়ের মধ্যেই কর্মচারী সংগঠন সীমাবদ্ধ নয়। নবান্নতে সরকারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ''ভারতবর্ষের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারীরা বেতন কমিশনের সুপারিশ থেকে বঞ্চিত, মহার্ঘভাতাও কম পাচ্ছেন। সেই দাবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে নবান্নতে গেপ্তার হলেন আঠারো জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে অন্য জায়গায় বদলি করলেও তাঁরা এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন। এই মানসিক দৃঢ়তা থাকার জন্যই সংগঠন শতবর্ষে পৌঁছেছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দু কুণ্ডু বলেন, ১৯২০ সালে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সংগঠনের জন্ম হয়। এখনও সেই সংগঠনের কর্মসূচী পালিত হচ্ছে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই। যত বাধা বিপত্তি আসুক, বদলি করা হোক, তাঁরা কর্মচারী সমাজের মধ্যে আছেন এবং থাকবেন। যে সব সরকারী কর্মচারীকে বদলি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই দিন উপস্থিত ছিলেন বিজয় শঙ্কর সিংহ, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, দেবাশিস মিত্র, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবলা মুখার্জি, মণীন্দ্র মাইতি এবং চিত্তরঞ্জন গুপ্ত।

এই কর্মসূচীতে রক্তদান করেন ১২৮ জন, মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন ১৩৮ জন এবং মরনোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন ১৪৮ জন। □

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনি শুনুন ...

গত ২৯ নভেম্বর, আমরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কয়েকজন কর্মী-সংগঠক, টিফিন বিরতিতে নবান্নে গিয়েছিলাম, আমাদের জরুরী কয়েকটি দাবি নিয়ে (দাবিগুলি কি আপনি জানেন) আপনার এবং আপনার পারিষদবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। রাষ্ট্র-বিরোধী বা রাজ্য বিরোধী কোন স্লোগান আমরা সেখানে দিই নি। আপনার পুলিশ রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, যে কয়েকটি মিনিট আমরা স্লোগান দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেই কয়েক মিনিটে শুধুমাত্র জরুরী কয়েকট দাবি নিয়ে আমরা কিছুটা স্লোগান দিয়েছিলাম মাত্র। এমনকি আমাদের বুকে যে পোস্টারগুলি ঝুলছিল, যা আপনার পুলিশ খোলার নির্দেশ না দিয়েই নির্মমভাবে ছিঁড়ে দিয়েছিল, সেখানেও মহার্ঘভাতা বেতন কমিশনের বাইরে আর কিছুই লেখা ছিল না। একথা যে একশ শতাংশ ঠিক, তা 'নবান্ন'-র চারিদিকে লাগানো সি সি টিভি'র ভিডিও ফুটেজ দেখলেই বুঝতে পারবেন। আবার শুধু নবান্নকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি টার্গেট করেছিল গোলমাল পাকানোর জন্য। তাও ঠিক নয়। যদিও বর্ধমানের কালনায় এক সভায় আপনি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ ঐ দিনই চাকুরি সংক্রান্ত বিধি মেনে টিফিন বিরতিতে রাজ্যের সর্বত্র, কলকাতার বড় বড় সরকারী ভবন থেকে শুরু করে জেলাগুলির ব্লক পর্যন্ত এই কর্মসূচী হয়েছে। আমাদের বিনম্র প্রশ্ন আপনার কাছে, সর্বত্র কর্মসূচী হতে পারলে নবান্নে কেন নয়? সমস্ত সরকারী দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীরা তাঁদের দাবি উত্থাপন করতে পারবেন, শুধু নবান্নের কর্মচারীরা পারবেন না? নবান্নে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরাওতো একই সরকারী বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহলে এই বৈষম্য কেন? বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মহাকরণ যখন প্রশাসনের প্রধান দপ্তর ছিল, তখনতো সেখানে টিফিন বিরতিতে অথবা ছুটির পর কর্মসূচী হত। সব সংগঠনই করত। এমন কি আপনার অনুগামী সংগঠনও কর্মসূচী পালন করেছে মহাকরণের অভ্যন্তরে। কখনও কখনও মাত্রা ছাড়া কর্মসূচীও করেছে। আজ আপনার মন্ত্রিসভা আলো করে আছেন এমন কেউ কেউ মহাকরণ ক্যান্টিন হলে আপনার অনুগামীদের সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দিয়ে এসেছেন। কৈ কোন সমস্যাতো হয়নি। কখনও পুলিস লেলিয়ে দেওয়া হয় নি। অবশ্য এসবই তখনকার কথা যখন, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার, আর আপনি বিরোধী নেত্রী। আপনি অবশ্য ক্ষমতায় এসে যে কদিন মহাকরণে ছিলেন, তার মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী মহাকরণ ক্যান্টিন হলের নকশা বদলে, সেখানে সভা করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। এমনকি মহাকরণের ভিতরে সংস্কারের নামে আমাদের সংগঠন দপ্তরগুলি ভেঙে দিয়েছিলেন কোনো বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা না করেই। তার মানে ক্ষমতায় থাকা বা না থাকার ওপর আপনার রাজনৈতিক দর্শন বদলায়? যখন বিরোধী আসনে তখন সরকার বিরোধী যে কোনো আন্দোলন (তা গণতন্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করলেও) তারিয়ে উপভোগ করলেন, আর ক্ষমতায় বসেই ন্যূনতম গণতান্ত্রিক কর্মসূচীও করতে দেবেন না? একেবারে ভোল পাল্টে ফেললেন? তাহলে কি বিরোধী নেত্রী হিসেবে তথাকথিত যেসব আন্দোলন করতেন, তা লোক দেখানো ছিল? মিডিয়া যে আপনার প্রতিবাদী জননেত্রীর ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছিল, তাহলে তাতো সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি কি ক্ষমতায় আসার জন্য লোক ঠকাচ্ছিলেন? নবান্নে শুধুমাত্র কর্মসূচী বন্ধ করেই আপনি থেমে থাকেন নি। আপনার নির্দেশে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করল, থানায় কয়েক ঘণ্টা বসিয়েও রাখল। এমনকি আপনি এতটাই প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠলেন যে পরের দিনই বিশেষ আদেশনামার ভিত্তিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব, যাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল, তাঁদের দার্জিলিং ও মুর্শিদাবাদে বদলি করা হল। আপনি তো এক ধাক্কায় আমাদের ৪৫ বছর পিছিয়ে দিয়ে আর এক মুখ্যমন্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

অথচ আমরা প্রতিদিনই দেখছি আর শুনছি,আপনি নাকি মোদীজীকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে একেবারে মরীয়া। এরাজ্যে ব্রিগেডে সভা করবেন, রাজ্যে, রাজ্যে ঘুরে বক্তৃতা দেবেন। তা ভাল। কিন্তু এটাতো গণতন্ত্রের চর্চা। তাহলে আপনি গণতন্ত্রের চর্চা করবেন, আর আপনার কর্মচারীরা সে সুযোগ পাবে না? এটা স্ব-বিরোধিতা নয়? নাকি আপনি শুধু প্রশংসাসূচক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন? আপনার প্রশংসায় যারা ঢাক পেটাবে, তারা যা খুশি করার সুযোগ পাবে, আর যারা আপনার সরকারের সমালোচনা করবে তাদেরই অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। গণতন্ত্রে সমালোচনার পরিসর থাকবে না? তাহলে সে গণতন্ত্রের মানে কি? অবশ্য আপনার সাথে গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা যে বৃথা, তা শুধু আমরা নই, রাজ্যের সাধারণ মানুষও বুঝে গেছেন। আপনার আমলে অনুষ্ঠিত সব ধরনের নির্বাচনে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির যে চেহারা হয়, তা দেখে গণতন্ত্রের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা-ভক্তি বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হয়ও না। এর অবশ্য একটা ব্যাখ্যা আপনি নিজের মত করে দিতে পারেন। তাহল লোকসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত, এমনকি স্কুল কমিটি বা সমবায় কমিটি পর্যন্ত যখন সর্বত্র দখলদারী কায়েম করাই আপনার লক্ষ্য, তখন শুধুমাত্র জনসমর্থনের ওপর নির্ভর করা বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ শুধু জনসমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হলে, জনস্বার্থবাহী কাজ করতে হয়। যা আপনি করেন না। আপনি এক ধরনের 'ডোল' ব্যবস্থা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চালু করেছেন, যা জনগণের হাতে পৌঁছনোর আগেই, তার বখরা নিয়ে আপনার 'উন্নয়ন বাহিনী' মারামারি কাটাকাটি করে। ফলে জনগণের আস্থা অর্জনে কঠিন পথ ছেড়ে, প্রশাসন ও ভৈরব বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের সহজ পথটি আপনি বেছে নিয়েছেন।

এটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু যেটা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তাহল মোদী সরকারের নীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘট করলেই, আপনি এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কেন ? অথচ আপনি নাকি দারুণভাবে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে? মোদী সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য আপনি নাকি দেশের বিভিন্ন নেতার সাথে শলাপরামর্শও করছেন? তাহলে সেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটকে তো আপনার নৈতিক সমর্থন দেওয়ার কথা। তা না করে আপনি ধর্মঘট ভাঙ্গতে চান কেন? তাহলে কি আপনার মোদী বিরোধিতা লোক দেখানো। দয়া করে ধর্মঘট পছন্দ করি না একথা বলবেন না। কারণ ক্ষমতায় বসার আগে মোট কতদিন ধর্মঘট ও বনধ করেছিলেন মনে আছে?

সেদিন নবান্নের ঘটনা বা তার পরেই প্রতিহিংসামূলক বদলী যে ধর্মঘটের আগে আমাদের ভয় দেখানো চেষ্টা তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন, ঘটেছে ঠিক তার উল্টো। রাজ্য জুড়ে কর্মচারীদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে। মহার্ঘভাতা বেতন কমিশন নিয়ে প্রতারণাও করবেন, আবার দাবি করলে ভয় দেখাবেন, হুমকি দেবেন — এভাবে কি চলতে পারে? আপনি গণতন্ত্র না মানলেও, আমরা তো মানি। তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই চলবে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে, আপনার সরকারের বিরুদ্ধেও। সেই লড়াইয়ের অপর নাম সাধারণ ধর্মঘট। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝেছি, মুখে আপনি যাই বলুন, আসলে আপনি এবং শ্রী নরেন্দ্র মোদী একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

নবান্ন

শিবপুর থানার সামনে

আলিপুরদুয়ার

উত্তর ২৪ পরগনা

বর্ধমান

দার্জিলিং

হাওড়া

মোদী সরকারের 'আচ্ছে দিন'

ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট

বর্তমান বছরের ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক বর্তমানে কার্যকরী শিল্প নিয়োগ (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস) আইন ও বিধি ১৯৪৬-এর সংশোধনী সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে। এই প্রস্তাবেই ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট ব্যবস্থা চালু করার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংশোধনীর খসড়া প্রকাশিত হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে বস্ত্র শিল্পে এই ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি চালু করে। পরবর্তী পর্বে চর্ম শিল্পেও একই ধরনের নিয়োগ পদ্ধতি চালু করা হয়। খসড়া সংশোধনীতে প্রস্তাবিত আইনটির নামকরণ করা হয়েছে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস) সেন্ট্রাল (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস ২০১৮।' উপরে উল্লিখিত মূল আইনটির ১৫ নং ধারা সংশোধন করে তৈরি করা হয়েছে নতুন আইনটি।

১৯৪৬ সালে প্রণীত মূল আইন অনুযায়ী নিয়োগকারী সংস্থাকে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের শর্তাবলী নির্দিষ্ট করতে হতো। সেখানে কী ধরনের নিয়োগ, যেমন স্থায়ী, অস্থায়ী, এ্যাপ্রেন্টিস, ক্যাজুয়াল, পার্ট-টাইম ইত্যাদি উল্লেখ করা ছিল বাধ্যতামূলক। ঐ আইনেই বলা ছিল, ১৫ নং ধারাটি সংশোধন করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে। সেই অধিকারের বলেই কেন্দ্রের মোদী সরকার বর্তমান ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। এই নতুন ধারণাটির সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, কোনো শ্রমিককে যদি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর তার চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা না হলে তাকে কাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর জন্য কোনো আগাম নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন থাকবে না। আর শ্রমিক কাজ ছেড়ে গেলেও একে প্রচলিত অর্থে ছাঁটাই বলা যাবে না। গত ৮ জানুয়ারি এ সংক্রান্ত যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাতে অবশ্য বলা হয়েছে, কোনো সংস্থা তার স্থায়ী শ্রমিককে ফিক্সড টার্ম শ্রমিকে অবনমিত করতে পারবে না।

বর্তমান ভারতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে ২ কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাতো হয়ইনি, উপরন্তু নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৪৫ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট আউটলুক' রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে (১৪-২৫ বছর বয়স পর্যন্ত) কর্মহীনতার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত কর্মসংস্থানের সুযোগ (সামাজিক সুরক্ষা সহ) সৃষ্টি না করে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। যেখানে শ্রমজীবী মানুষ তীব্রতর শোষণের শিকার হবেন। মোদী সরকারের পক্ষ থেকে নিজেদের কর্পোরেট প্রেমকে আড়াল করার জন্য দাবি করা হয়েছে যে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যে বক্তব্যের আদৌ কোনো সারবত্তা নেই। বরং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের 'দাস' নিয়োগের ব্যবস্থা হতে চলেছে। সি আই টি ইউ সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই ব্যবস্থা চালু করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। এমনকি আর এস এস পরিচালিত এবং বিজেপির সহযোগী ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘও এর বিরোধিতা করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে বস্ত্রশিল্পে এই আইনটির প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হয়েছিল, সেখানে এর ফল হয়েছে নেতিবাচক। উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি— উভয়ই রাশ পেয়েছে। স্বভাবতই আগামী ৮-৯ জানুয়ারির ধর্মঘটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা। □

প্রচলিত শ্রম আইনের সংশোধন

কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে প্রচলিত ৪৪টি শ্রম আইনকে ৫টি লেবার কোডের মধ্যে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে প্রচলিত শ্রম আইনের সরলীকরণ। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি এবং ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া। সম্প্রতি দুটি লেবার বোর্ড গঠন করা হয়েছে— (১) লেবার বোর্ড অন ওয়েজেস বিল এবং (২) লেবার বোর্ড অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস। লেবার বোর্ড অন ওয়েজেস বিলে বেতন সংক্রান্ত চারটি শ্রম আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হলো ন্যূনতম বেতন আইন, পেমেন্ট অফ ওয়েজেস এ্যাক্ট, বোনাস এ্যাক্ট এবং সম কাজে সম বেতন। লেবার বোর্ড অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস-এ তিনটি শ্রম আইনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হলো— ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট ১৯২৬, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়মেন্ট এ্যাক্ট ১৯৪৬ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট ১৯৪৭। এই দুই লেবার বোর্ড গঠনের মূল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকারহীন করা এবং ইচ্ছেমতো শ্রমিক নিয়োগ ও ছাঁটাই (হায়ার এ্যান্ড ফায়ার) করার অধিকার মালিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেয়া। এমনকি এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিভিন্ন কনভেনশনে শ্রমিকশ্রেণীর যে অধিকারগুলি স্বীকৃত হয়েছে, তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। অথচ ভারত সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

এই প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হলো, এতদিন পর্যন্ত ১০০ জন পর্যন্ত বা তার কম কাজ করেন এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারের কাছ থেকে কোনো আগাম অনুমতির প্রয়োজন হত না। বর্তমানে সেই সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে ৩০০ করা হয়েছে। যার ফলে আমাদের দেশে ৯০ শতাংশ উৎপাদন কেন্দ্রের মালিক এর সুযোগ নিতে পারবেন এবং ইচ্ছেমতো হায়ার এ্যান্ড ফায়ার চালু করতে পারবেন। সর্বাধিক উদ্বেগের বিষয় হলো, শ্রমিকশ্রেণীর বহু লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত ধর্মঘটের অধিকারকেও কেড়ে নেয়া হবে। কারণ নতুন আইনে ধর্মঘট করলে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা একমাস কারাবরণের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এমনকি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘট না করে ধর্মঘটে সাহায্য করলেও একই ধরনের শাস্তি র মুখোমুখি হতে হবে। ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেয়ার এই কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তেরই ছায়া আমরা দেখতে পাই রাজ্য সরকারের ধর্মঘটকেন্দ্রীক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। □

৮, ৯ জানুয়ারি ২০১৯, সাধারণ ধর্মঘট

এ লড়াই বাঁচার লড়াই এ লড়াই জিততে হবে

বিজয় শংকর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

এসো জনতার মুখরিত সখ্যে

এক দশক আগে শুরু হওয়া বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রকোপে সারা বিশ্বের অর্থনীতির কাঠামোগত সংকট আরো গভীরে প্রবেশ করেছে। তা কাটিয়ে ওঠার কোন লক্ষণ প্রতিফলিত হচ্ছে না, এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশ্বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শোষণ আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। বর্তমানে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে পুঁজিবাদের যেকোনো প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে তাই নয় আরো গভীর সংকটে আবদ্ধ হচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল, সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী জমানায় এই প্রক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে। এই সর্বোচ্চ লাভের লক্ষ্যে তারা যেকোনে অসৎ কাজ করতে প্রস্তুত। সর্বোচ্চ লাভের লক্ষ্যে নয়া উদারবাদ সারা বিশ্বে এক অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সর্বোচ্চমুনাফা লাভের নতুন পথ তৈরী করেছে এবং সবরকম সামাজিক পরিষেবা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে বেসরকারীকরণ করছে। স্বাভাবিকভাবে এই ভয়ংকর নীতির ফলে দেশে দেশে ধনী ও গরীব মানুষের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অসাম্য দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এই ধরনের চরম আক্রমণের ফলে বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা চলছে, যার ফলে জাতি বিদ্বেষ, অভিবাসিদের উৎখাত, অহেতুক বিদেশী বিদ্বেষ এবং চরম দক্ষিণপন্থী নব্য-ফ্যাসিস্ট ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে/বিশ্বের দেশে দেশে বামপন্থীদের নেতৃত্বে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বিপদ ও আক্রমণের প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করছে এবং আশার দিক তা আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে আড়াই দশকের বেশী সময় ধরে নয়া উদারনীতির বিষময় প্রক্রিয়ার ফলে দেশব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে এক ভয়াবহ মারাত্মক সংকট আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, চাকুরীচ্যুতি, বেকারী, দারিদ্র্য সহ একাধিকভাবে আক্রান্ত দেশের সর্বস্তরের শ্রমজীবী জনগণ। আর এস এস, বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকারের সাড়ে চার বছরে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা আজ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বা দুর্বিষহ হচ্ছে তার কোন অতীতের বা পূর্ব নজির নেই।

বিশ্বায়ন বেসরকারীকরণ উদারীকরণের বিষাক্ত আক্রমণ থেকে শ্রমীজীবী মানুষকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক যে সুরক্ষাগুলি ছিল তাকে আরো প্রসারিত বা শক্তিশালী না করে মানুষকে যে সামান্য পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তা আরো সংকুচিত করার প্রক্রিয়া জারি রেখেছে দেশের আর এস এস, বি জে পি পরিচালিত মোদি সরকার।

বামপন্থীদের আন্দোলনের চাপে গ্রামীণ ও শহরের গরীব মানুষের একশো দিনের কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এছাড়া আই সি ডি এস সহ অন্যান্য সামাজিক প্রকল্প সাধারণ মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার একটা উপায় সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সম্প্রসারণ তো দুরের কথা এইসব সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকায় প্রকল্পগুলি গুটিয়ে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, এ এক ভয়ংকর দিক।

এছাড়া জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প, ব্যাংক, বীমা এবং সরকারী পরিষেবার ফলে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে তা বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে দুর্বল করা হচ্ছে। রেল, প্রতিরক্ষা, টেলিকম সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবেশকে সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের ও বড় ব্যবসায়ীদের প্রতি বাজেটে লক্ষ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এসব পুঁজিপতি ও কর্পোরেটদের ব্যাংক থেকে প্রায় দশ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার পরেও পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, ব্যাংকের ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে নামের তালিকা দিলেও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এক অদ্ভুত সরকার চলছে।

দেশের ৬৫ শতাংশ তথা সিংহভাগ মানুষ কৃষক ও কৃষিকাজে যুক্ত, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন না হলে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য থাকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে এদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হলে দেশের Economy Balnace রাখতে পারে না। ব্যাংক থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে সরকার ও মন্ত্রীদের সহযোগিতায় দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে আর দেশের কৃষকদের ঋণ মকুব করতে প্রয়োজন মাত্র কয়েক হাজার কোটি টাকা তা মঞ্জুর করতে দেশের সরকার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বিগত আড়াই দশকে প্রায় ৩ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে যা দেশের ৭২ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে লজ্জার।

এক কথায় মানুষের ন্যায্য অধিকার জীবন-জীবিকার আজ শোচনীয়ভাবে আক্রান্ত। পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া ব্যাপক হারে দর বৃদ্ধির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আজ আকাশছোঁয়া। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার রসদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ আজ বড় অসহায়। আর এস এস, বি জে পি সরকার লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রতি বছর ১ কোটি বেকারের চাকুরী দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দেশে বা বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-এ ১৫ লক্ষ করে টাকা দেবে ও কৃষকদের ফসলের দেড় গুণ দাম সুনিশ্চত করা সহ একাধিক গলাভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে নয়া উদারনীতির দাপটে ১ কোটি কর্মরত যুবক যুবতী সাড়ে চার বছরে কাজ হারিয়েছে। কালো টাকার আরো পাহাড় জমেছে। শুধু তাই নয়, ব্যাংক থেকে সাধারণ মানুষেব গচ্ছিত হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সহায়তা নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। কৃষক ফসলের দাম না পাওয়ায় আত্মহত্যা বিগত সাড়ে চার বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর আবার জি এস টি ও নোট বাতিলের কোপে মানুষ দিশেহারা।

এছাড়া রাফালে ৩০,০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি। অমিত শাহের পুত্র ও দেশের অর্থমন্ত্রীর কন্যার দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতি চলছে। সি বি আই-এর আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছিলেন বলে তাদের ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। আর এস এস, বি জে পি-র আসল চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে। বেআইনিভাবে সি বি আই-এর আধিকারিক করা হয়েছে কট্টর আর এস এস-এর অনুগত এম নাগেশ্বর রাওকে। সি বি আই-এর কোনো বরিষ্ঠ যুগ্ম আধিকারিকদের ঐ পদে বসানো হয়নি, নির্লজ্জভাবে অনিয়ম করা হয়েছে। অতীতে কোনদিন এরকম ন্যক্কারজনভাবে সি বি আই-এর উপর হস্তক্ষেপ হয়নি, যা নজিরবিহীন। প্রশাসনিক, আর্থিক ও শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ চলছে। এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এই হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দায় প্রতিবাদ করছেন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নয় দারুণ জঙ্গী রূপ নিচ্ছে যা অবশ্যই আশার দিক। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের লং মার্চ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যে শ্রমিক কৃষক তথা শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। সমসাময়িক ৯ আগস্ট '১৮ শ্রমিক কৃষকদের জেল ভরো আন্দোলন। ৪ সেপ্টেম্বর '১৮ দিল্লীতে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে মহিলাদের জমায়েত ও ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিক কৃষক তথা শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেহারা নিয়ে পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচী যা এই সময়কালে নজিরবিহীন। দেশের আর এস এস, বি জে পি-র সরকারের প্রধানমন্ত্রী ৫৬ ইঞ্চি চওড়া বুকে কম্পন ধরিয়েছে।

মোদি সরকারের বহুমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যখন শ্রেণী আন্দোলন ও গণ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে বিভাজন সৃষ্টি করতে আর এস এস, বি জে পি বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি আমদানি করছে, শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিভাজন ঘটানোই হলো এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। চরম দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত আর এস এস দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদকে ধ্বংস করতে চায়। দেশের কাছে সবচেয়ে বিপদের দিক হল— রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ ও অধিকাংশ রাজ্যের রাজ্যপালের পক্ষে আছেন সব আর এস এস-এর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। যা দেশের ঐক্য ও সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ভয়ংকর বিপদের দিকে। বিভিন্ন শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আর এস এস-এর প্রতিনিধিদের মাথায় বসানো হয়েছে। এবং এর প্রতিবাদ করায় একাধিক প্রতিষ্ঠিত সম্মানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে বা জেলে পোরা হচ্ছে।

এক কথায় দেশের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষা ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাকে প্রসারিত করতে মোদি সরকার আরো স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠছে যা ভয়ংকর দিক। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে শ্রম আইন সংশোধন করে মালিকের বা পুঁজির স্বার্থবাহী করা হচ্ছে। দেশের সংখ্যালঘু, দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর নির্বিচারে যেকোন অজুহাতে নৃশংসভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, এমনকি খুন করা হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্রীতদাসের মত দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ অংশীদার হওয়ায় জন্য একের পর এক সামরিক চুক্তি করছে যা দেশের পক্ষে অপমানজনক যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আঘাত করছে।

দেশের ৪টি মূলস্তম্ভ অর্থাৎ অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বাধীন বিদেশনীতি আজ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। আর এস এস, বি জে পি তাদের শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করতেই এই দেশবিরোধী জঘন্যতম কাজ করে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আমাদের রাজ্যেও সাধারণ মানুষ আজ মারাত্মকভাবে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজ্যের শাসক দলের লুম্পেন সমাজ বিরোধীদের দাপটে ত্রিমুখী আক্রমণে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত। রাজ্যের মানুষের জীবন-জীবিকা, গণতন্ত্র ও রবীন্দ্র-নজরুলের পশ্চিমবাংলা আজ বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতিতে আক্রান্ত।

২০১১ সালের পর রাজ্যের রাজনৈতিক ভারসম্যের পরিবর্তনে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ও সার্বিকভাবে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ ও জটিল ও কঠিন হয়েছে। রাজ্যে গণতন্ত্রের উপর নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আমাদের কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেছেন যে ব্যাপক সন্ত্রাস ও ভোট লুঠ তা ভু ভারতে কোথাও কোনদিন হয়নি। ৩৪ শতাংশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া, ভোট লুঠ সহ গননায় রিগিং যা রাজ্যের গণতন্ত্রকে সমাধিস্থ করেছে। পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন সহ শ্রমিক-কর্মচারী শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে। প্রশাসনে সর্বত্র স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এলাকায় এলাকায় সমাজের সর্বত্র লুম্পেন সমাজবিরোধীদের দাপট অব্যাহত যা মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন অসহনীয় করে তুলেছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করলে যারা আক্রান্ত তাদের ভয় দেখানো বা জেলে পোরা হচ্ছে। এ এক স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের ধাঁচের সরকার চলছে। কিন্তু প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। আমরা প্রশাসনের অভ্যন্তরে একাধিক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যেমন করেছি বা ভবিষ্যতে আর্থিক অধিকারগত দাবি নিয়ে বৃহত্তর ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা বলেছি, তেমনিভাবে শিক্ষাঙ্গনে, হাসপাতালে, পাড়ায় পাড়ায় সমাজের অভ্যন্তরে বীর ছাত্ররা দেখিয়ে দিয়েছে। চোখে চোখ রেখে কথা বলে, মাথা নত করতে বাধ্য করেছে নবান্নর ১৪ তলার মহারাণীকে। তাই সাবধান, প্রতিদিন তা বাড়ছে, আরো বাড়বে তো অবশ্যই, আরো তীব্র হবে। পৃথিবীর ইতিহাস তাই বলে। উত্তরবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে নির্মমভাবে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ছাত্র। এর প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে বলে উত্তরবঙ্গের কলেজে ছাত্রীকে জেলে পোরা হয়েছে। সারা রাজ্যজুড়ে ক্ষোভে শারদীয়ায় ফেস্টিভ মুডেও হাজারো মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে ... কত জেলে নিবি নে এই মানসিকতা নিয়ে। এ এক অদ্ভুত সরকার চলছে। কুশপুত্তলিকা পোড়ালেও মরার ভয়। কারণ যারা সারদ নারদ করেছে, প্রশাসনের ব্যাপক দুর্নীতি করছে, রাজ্যের সব মানুষ প্রত্যক্ষ করছে তাই ভয় পাচ্ছে। ৩৪ বছরে মুখ্যমন্ত্রীর হাজারো কুশপুত্তলিকা বর্তমানে যারা রাজ্য চালাচ্ছে তারা পুড়িয়েছে। কেউতো জেলে যায়নি।

বর্তমানে রাজ্যের আইনশৃংখলার পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। নারী নির্যাতন, নারী পাচার, গুণ্ডামি, খুনখারাপি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে খুন হতে হচ্ছে এমনকি ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নিজেরা দলের মধ্যে মারামারি করে খুন হচ্ছে। পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে হাজার হাজার কোটি টিকা কার দখলে থাকবে তাই নিয়ে নিজেরা বোমা গুলিতে মরছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নেই বললেই চলে।

গত সাড়ে সাত বছরে কর্মচারীরা সীমাহীন পাহাড় প্রমাণ বঞ্চনার শিকার হয়েছেন যা ভূ-ভারতে কোথাও নেই। প্রায় সব রাজ্যে কর্মচারীরা মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের বর্ধিত বেতন ভোগ করছে আমাদের রাজ্যে বকেয়া ৫৬ শতাংশ মহার্ঘভাতাসহ বেতন কমিশনের প্রাপ্য বর্ধিত বেতন যুক্ত করলে দাড়ায় কয়েক লক্ষ টাকা একজন নিম্নস্তরের ও উর্ধ্বতন এবং অবসরপ্রাপ্ত-কর্মচারীরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

একদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি আর একদিকে বঞ্চনা চলছে। বর্তমান রাজ্য সরকার ধর্মঘট করলে একদিনের বেতন কাটবে, এতে কত ক্ষতি হবে যেখানে বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ষষ্ঠ রাজ্য কাউন্সিল সভা

কাউন্সিল সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

গণআন্দোলনের অংশ হিসাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাঁকেই পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাতের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা প্রতিপালন করেছিল। তাই বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতই চেষ্টা করা হোক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির লড়াই আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। গত ২৯ নভেম্বর বকেয়া ডি.এ, পে-কমিশনের দাবি জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর ১৮ জন সদস্যকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হয়েছে, পরবর্তীতে তাদের ৮-৯ জনকে বদলি করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং-এর মতো দূরদূরান্তে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে রাজ্যসরকারের উদ্দেশ্য সফল হবে না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ-এর যোগ্য জবাব দেবে আগামী দিনে। বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেউই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙতে পারেন নি। উপড়েও ফেলতে পারেননি বরং কো-অর্ডিনেশন কমিটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে এটাই পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে। তাই আগামীতেও দাবি আদায়ের আন্দোলন চলবে একই গতিতে। বরঞ্চ তা আরও শক্তিশালী হবে সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক আচরণের কারণে এবং পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজ শ্রমজীবী জনগণের অংশ হিসাবে-এর সমূচিত জবাব দেবেন শাসকশ্রেণীকে আগামী ৮-৯ জানুয়ারী ২০১৯-এর দেশব্যাপী ধর্মঘটে গোটা রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করার মধ্য দিয়ে। ষষ্ঠ রাজ্য কাউন্সিল সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথাগুলি বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ।

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক রাজ্য কাউন্সিল-এর ষষ্ঠ সভা বিগত ১-২ ডিসেম্বর ২০১৮ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য এবং সহ-সভাপতিত্রয় সুনির্মল রায়, গীতা দে ও প্রশান্ত সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মণ্ডলী। সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে শোকপ্রস্তাব উত্থাপনের পরবর্তীতে কাউন্সিল সভায় উপস্থিত সকলে প্রয়াতদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করেন।

প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা উত্থাপন করতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন গত ২০ নভেম্বর ২০১৮ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বর্তমান সময়ে দেশের ও রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাবলী সহ ধারাবাহিকভাবে একাধিক সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী ও সাংগঠনিক দায়িত্বসহ বিভিন্নমুখীন কাজের পর্যালোচনা করা হয়। বিগত রাজ্য-পঞ্চম কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ২৬শে নভেম্বর ২০১৮-র মধ্যে যদি পে-কমিশন কার্যকর করা না হয় তাহলে পুনরায় পথে নেমেই আন্দোলনের কর্মসূচীতে শামিল হতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৬ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০১৮ রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরে, মহকুমা সদরে স্কোয়াড এবং বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত হয়। ২৯ নভেম্বর জেলা সদর সহ কলকাতার প্রতিটি অঞ্চলে এবং মহকুমা সদর সহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে টিফিনের সময় বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করা হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সচিবালয় নবান্নতে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা টিফিন বিরতিতে বকেয়া মহার্ঘভাতা এবং বেতন কমিশনের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী করতে পৌঁছে যান। কিন্তু দাবির সমর্থনে শ্লোগান শুরু করা মাত্রই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে পুলিশভ্যানে তোলা হয় এবং ১৮ জন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যকে শিবপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় আসামীদের মতো। পরবর্তীতে বিকাল ৫.৩০ মিনিটের পর তাদেরকে মুক্ত করা হলেও প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক আচরণের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে গ্রেপ্তার হওয়া কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের দূরদূরান্তে বদলীর সরকারী আদেশনামা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা এটাই বলছে নেতৃত্ব-কর্মীদের বদলী করার মধ্য দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শক্তি হ্রাস করা যায়না বরং সংগঠন আরও ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার পরবর্তীতে কর্মী নেতৃত্বের ইতিবাচক মানসিকতার মধ্য দিয়ে ৩০ নভেম্বর রাজ্য প্রশাসনের এই নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে আরও বেশী বেশী সংখ্যায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেছেন, সেখানে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ক্ষোভ এবং ধিক্কার জানিয়েছেন। পরিস্থিতির গভীরতাকে অনুধাবন করে কর্মী নেতৃত্বের এই ইতিবাচক মানসিকতা ও হার না মানা মনোভাবকে সঙ্গী করে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই আমাদের সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন গোটা বিশ্বেই শ্রমজীবি মানুষ দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন কিন্তু দ্বান্দ্বিক নিয়মেই এর পরিবর্তন ঘটবে। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণী সহ সাধারণ মানুষ ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই পুজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকার দারুণভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে গরীব খেটেখাওয়া শ্রমজীবী মানুষের ওপর। কৃষিক্ষেত্র দারুণভাবে আক্রান্ত এর বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজ প্রতিবাদ প্রতিরোধে শামিল হচ্ছেন। বিগত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহবানে পার্লামেন্ট অভিযানের কর্মসূচী দারুণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সমাবেশ থেকে কেন্দ্রের মোদী সরকারের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক মারা, শ্রমিক মারা সর্বোপরি দেশের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের স্বার্থ বিনষ্ঠকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে গোটা দেশকে দেশের মেহনতী মানুষ স্তব্ধ করে দেবেন আগামী ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯-এর দেশজোড়া দুদিনের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। উদার অর্থনীতিতে সঙ্কটগ্রস্থ দেশের কৃষকসমাজ সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যার পথ, কিন্তু তাতেও শাসক শ্রেণীর মনে কৃষকের এই নিদারুণ সঙ্কট কোনো রেখাপাত করেনি। অবহেলিত অন্নদাতারা আজ ঘুরে দাঁড়িছেন লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের লংমার্চ গোটা দেশের মানুষের মনে দারুণ রেখাপাত করেছে। মাহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ এই লঙমার্চকে সমর্থন করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার বাধ্য হয়েছে কৃষকের দাবি মেনে নিতে। তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন, লাগাতার পথে নামছেন, দাবির সমর্থনে আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন। আমাদের রাজ্যেও BPMO-র নেতৃত্বে কৃষকেরা পথে নেমেছেন বিগত ২৮-২৯ নভেম্বর, আমাদের রাজ্যের বুকেও কৃষকেরা সিঙ্গুর থেকে কলকাতা লঙমার্চ অভিযান সংগঠিত করেছেন। গোটাদেশের শ্রমিকশ্রেণী কৃষকসমাজ যখনঐক্যবদ্ধ হচ্ছে বামপন্থীদের নেতৃত্বে তখন এই ঐক্যকে ভাঙার জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণেকে হাতিয়ার করছে দেশের বর্তমান শাসক শ্রেণী। একদিকে দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে ১০০ শতাংশ। অপর দিকে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর ওপর আক্রমণ, সংবিধানের ওপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা তিনটি প্রধান ক্ষেত্রই আক্রান্ত আর দেশের সংবাদমাধ্যম পুঁজিবাদের অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ের প্রধান অভিমুখ হবে দেশজোড়া ধর্মঘটকে সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা। একে কেন্দ্র করে দপ্তরে দপ্তরে সভা করতে হবে, জেলা-অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা যাবেন, কর্মীসভা, সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে আমাদের বক্তব্য সমস্ত কর্মচারীর কাছে তুলে ধরতে হবে।

বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ১১ আগস্ট কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক কর্মসূচী মৌলালী যুবকেন্দ্রে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ আগস্ট ২০১৮ আর্থিক ও অধিকারগত দাবিদাওয়া নিয়ে ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহ বিগবাজার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মহামিছিল ও জমায়েতের কর্মসূচী বামপরিষদীয় দলনেতা ডঃ সুজন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে দারুণ সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। জেলাগুলিতেও উক্ত কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়, বিগত ৮-৯ সেপ্টেম্বর সংগঠনের উদ্যোগে প্রথম রাজ্য মহিলা কনভেনশন কর্মচারী ভবনে অরবিন্দ সভাকক্ষে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্য থেকে আসা মহিলা সহকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে জেলায় ও কলকাতার অঞ্চলগুলিতে মহিলা কর্মীদের নিয়ে সভা করে কনভেনশনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ৯ অক্টোবর ২০১৮ মৌলালী যুবকেন্দ্রে রাজ্যের সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি এবং ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ এর সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার শপথ গ্রহণ করা হয়। ৩১ অক্টোবর ২০১৮ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেয়াদ আরও ৬ মাস বৃদ্ধির প্রতারণামূলক ঘোষণার প্রতিবাদে টিফিনের সময় রাজ্যজুড়ে দপ্তরে দপ্তরে বিক্ষোভসভা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

তহবিল সংগ্রহ প্রসঙ্গে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি বলেন সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযানে সাফল্য থাকলেও আরও কর্মচারীর কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ ছিল। যদিও গৃহীত সাংগঠনিক উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। সর্বত্র দারুণ সাংগঠনিক উদ্যোগ ছিল যা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ইতিমধ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিল্লী AISGEF-এর বর্ধিত সভায় বিগত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ কেরালা বন্যা ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়েছে।

আগামী কর্মসূচী বিষয়ে বলতে গিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন এ মুহূর্তের সর্বপ্রধান কর্মসূচী আগামী ৮-৯ জানুয়ারী ২০১৯ সারাভারত সাধারণ ধর্মঘট সফল করা। একে কেন্দ্র করে আগামী ৪-৫ ডিসেম্বর কলকাতার অঞ্চলগুলিতে এবং ১১-১২ ডিসেম্বর জেলাগুলিতে জেলা সফরের কর্মসূচী সংগঠিত হবে। সমস্ত অন্তর্ভুক্ত এবং সহযোগী সমিতিগুলিকেও একে কেন্দ্র করে পরিপূরক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন জেলা এবং অঞ্চলগুলি সাংস্কৃতকি অনুষ্ঠান এবং রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত করেছে। যারা এখনও এই কর্মসূচী প্রতিপালন করেনি তাদের অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয়ে তিনি বলেন সমিতিগুলির সদস্য নবীকরণ কর্মসূচীকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ডিসেম্বর ২০১৮-র মধ্যে আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। একে টাস্ক হিসাবে গ্রহণ করে এগোতে হবে। পত্রপত্রিকার গ্রাহকভুক্তি এবং সংগঠন তহবিলের বকেয়া থাকলে অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে তিনি বলেন কর্মচারীদের ভয়ভীতি রয়েছে, নীরব সন্ত্রাস রয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে লাগাতার কর্মসূচী প্রতিপালন করা হচ্ছে সাফল্যের সাথে। এই সাফল্যকে সংহত করেই আমাদের এগোতে হবে। এবারের ধর্মঘটের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্নধর্মী কারণ এর পরবর্তীতেই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ক্ষেত্রে শাসকদলের পরিবর্তন ঘটলে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে। তাই দেশের মানুষের স্বার্থে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সকলকে যুক্ত করেই এই লড়াইতে শামিল হতে হবে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ১৯টি জেলা, কলকাতার ৭টি অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির প্রতিনিধিরা পরিস্থিতির নিরীখে এবং সংগঠনের অবস্থা বিষয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করেন এক আগামী পথ চলার বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ব্যক্ত করেন, একই সঙ্গে নবান্নে গৃহীত সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণর জন্য নেতৃবৃন্দকে লাল সেলাম জানান। সমগ্র আলোচনা সূত্রায়িত করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী শুরুতেই হাওড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী নেতৃত্ব সহ গোটা রাজ্যের কর্মচারী সমাজের লড়াকু মানসিকতাকে কুর্নিশ জানান। তিনি বলেন পরিস্থিতির নিরীখে আরও আক্রমণাত্মক কর্মসূচী আগামীতে গ্রহণ করতে হবে, ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে যেমন প্রচারের কর্মসূচী চলবে তেমনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর প্রতিহিংসামূলক আচরণের বিরুদ্ধে আগামী ১১-১২ ডিসেম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। গোটা দেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। কৃষক-শ্রমিক লাগাতার পথে নামছেন। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করছেন। লোকসভায় শক্তি হ্রাস হলেও দেশজোড়া শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করছেন। গোটাদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা প্রতিপালন করছেন। আমাদের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র কর্মচারীর দাবি নয় শ্রমজীবী মানুষের দাবিকেও সমর্থন করতে হবে। আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ স্ট্রাইক নোটিশ ডে-র কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে রানী রাসমণিতে এবং জেলা সদরগুলিতে প্রতিপালিত হবে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে ধর্মঘটের আমাদের অংশগ্রহণ মানে পরিবারকেও তাতে যুক্ত করতে পারব। আমাদের সকলকে নেতৃত্বের ভূমিকা প্রতিপালন করতেহবে। ত্যাগ স্বীকার অতীতেও হয়েছে, এখনও করতে হবে। আন্দোলন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে, এটাই সংগঠনকে মজবুত করার উপযুক্ত সময়। ধর্মঘটের বার্তা সমস্ত অংশের কর্মচারীর কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বিভেদের শক্তির বুকেও আমাদের কাঁপন ধরাতে হবে। ধর্মঘটকে ঐতহাসিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। Collective Funcfioning কে আরও Develop করতে হবে।

রাজ্য কাউন্সিল সভায় সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন ভবিষ্যৎ বলবে ঐতিহাসিক ভূমিকা আমরা পালন করতে পারলাম কিনা। লোকবল আমাদের শক্তি। দলমত নির্বিশেষে সকলকে যুক্ত করতে হবে। বহুমাত্রিক প্রচারে আমাদের যুক্ত করতে হবে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে রাস্তা কেউ কাউকে ছেড়ে দেয়না, রাস্তা তৈরী করে নিতে হয়। আমাদেরও এ ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে নতুন পথে অগ্রসর হতে হবে। আদর্শকে পাথেয় করে অবিচল সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। □ *দেবাশীষ রায়*

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

এ লড়াই বাঁচার লড়াই

দলমত নির্বিশেষে সব অংশের কর্মচারীদের চরম বঞ্চনার প্রতিবাদে বৃহত্তর সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার সর্বত্র প্রস্তুতি নিতে হবে এবং রাজ্য প্রশাসনকে স্তব্ধ করেই বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে বাধ্য করতে হবে সরকারকে।

বিগত দুমাসে ৩৪ দিন ছুটি দিয়েছে সরকার, ধর্মঘট করলে সরকার বলে কর্মসংস্থান নষ্ট হচ্ছে। আবার সরকারই টানা ছুটি দিচ্ছে। এই ছুটির ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতি হচ্ছে পরিষেবার। আর্থিক দায়িত্ব না পালন করে শুধু ছুটি দেওয়ার এই নীতির আমরা বিরোধী, কারণ আমরা মনে করি প্রায় দু লক্ষাধিক শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজন নেই এই বার্তা দিতে চায় রাজ্য সরকার। ছুটি থাকলেও প্রশাসনের কাজ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এত কর্মীর প্রয়োজন নেই। এক কথায় ছুটির আড়ালে কর্মসংকোচনের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। যা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীদের পক্ষে ভয়ংকর সংকেত দিচ্ছে।

আমাদের পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা ৫৬ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা— যা ভূভারতে কোথাও নেই। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন ৩ বছর পর আরো ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রতারণামূলক ঘোষণার পর তা সূর্যের মুখ দেখাবে কি না এখন অনিশ্চিত। এছাড়া প্রশাসনে লক্ষাধিক শূন্যপদ যেখানে বেকার যুবক যুবতীরা চাকুরী করতে পারত। চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতন, নিয়মিত কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা প্রদান ও ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। স্বাভাবিকভাবে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে গত ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে সর্বভারতীয় কনভেনশন মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা ১২ দফা দাবি নিয়ে এছাড়া কর্মচারী সমাজের ন্যায্য পাহাড় প্রমাণ আর্থিক ও অধিকারগত বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ সাধারণ মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সারা দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জোর ধাক্কা দিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শপথ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে অচল করার ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তুলুন। □

৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯-এ অনুষ্ঠিতব্য দু-দিনব্যাপী সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, নয়া দিল্লীর মবলঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত কনভেনশন থেকে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশনগুলি যৌথভাবে দু'দিনব্যাপী সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ১২ দফা দাবিকে সামনে রেখে আগামী ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত হবে এই ধর্মঘট। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ নিয়ন্ত্রিত এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সহযোগী ট্রেড ইউনিয়ন বি এম এস বা ভারতীয় মজদুর সংঘ একমাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যারা এই ধর্মঘট থেকে সরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অথচ এই বি এম এস-ই কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ধর্মঘটসহ সমস্ত যৌথ আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচীগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন সহ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক-বীমা-টেলিকমিউনিকেশন, প্রতিরক্ষাসহ বিভিন্ন শিল্প ও পরিষেবা (সরকারী ও বেসরকারী) ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের জাতীয় ও রাজ্য স্তরের ফেডারেশনগুলিও ধর্মঘটের এই সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। আমাদের দেশে বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের গোড়া থেকে অর্থনীতির নয়া উদারবাদী সংস্কার প্রক্রিয়া চালু হয়। সেই সময় থেকেই সি আই টি ইউ সহ বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার নিরিখে এই সংস্কার প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধীতা করে। শুরুর সেই লড়াইয়ে অবামপন্থী ট্রেড ইউয়িনগুলি ছিল না। সংসদের অভ্যন্তরে ও রাজপথে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির লড়াই-আন্দোলন, এবং শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিতে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ধারাবাহিক প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে একের পর এক সর্বভারতীয় ধর্মঘট। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৯১ সালে, অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার বছরেই। এই প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা হল, সমগ্র নব্বই-এর দশক এবং একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত এই ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ- কারী শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার শ্রমজীবী মানুষের ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক শীর্ষবিন্দুগুলিতে শুধুমাত্র সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটগুলিই অনুষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, ক্ষেত্রভিত্তিক উপর্যুপরি ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়েছে শিল্পোৎপাদন ও পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্র। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক-বীমার ন্যায় আর্থিক ক্ষেত্রগুলির সাথে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের চোয়াল শক্ত করে লড়াই। এই লড়াই শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রগুলির শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবিকাকে রক্ষা করেছে তা নয়, ২০০৮ সালে শুরু হওয়া বিশ্ব মহামন্দার প্রবল গ্রাস থেকে অনেকটাই রক্ষা করতে পেরেছে দেশীয় অর্থনীতিকে। মর্গান-স্ট্যানলি বা এ আই জি-র মতন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়েনি আমাদের এল আই সি অথবা এস বি আই।

আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে যৌথভাবে নয়া উদারবাদের অন্যতম কুফল নয়া পেনশন স্কীমের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হয়েছে। ধর্মঘটসহ ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের ফলে, বহু ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি এবং দেশীয় কর্পোরেট লবির আকাঙ্খা অনুযায়ী সংস্কারের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার বা অধিকাংশ রাজ্য সরকারগুলি করে উঠতে পারেনি, একথা যেমন ঠিক, তেমনই একথাও ঠিক যে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেও নয়া উদারবাদী সংস্কারের গতিমুখকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করাও সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই, নয়া উদারবাদী সংস্কারের অব্যাহত প্রক্রিয়া, শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছে। উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের সমবেত আক্রমণে সৃষ্ট পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও বাধ্য করেছে লড়াই-এর ময়দানে হাজির হতে। ২০১০ সাল থেকেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মঞ্চে হাজির হয়েছে আই এন টি ইউ সি বা বি এম এস-র মতন বৃহৎ অবামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

এবারের কনভেনশন থেকে সঙ্ঘ পরিবারের চাপে বি এম এস সরে গেলেও, অপরাপর ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবেই এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। যাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে অর্ধশতাধিক জাতীয় ও রাজ্যভিত্তিক গণসংগঠন।

নয়াদিল্লীর কনভেনশনে কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকারকে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী, জনস্বার্থ বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে শুধুমাত্র ধর্মঘটকে সফল করাই নয়, আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করার ডাকও দেওয়া হয়েছে। কনভেনশনের ঘোষণা-পত্রে আরও বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর এবং ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর দু'টি সফল সর্বভারতীয় ধর্মঘটের পরেও মোদি সরকারের সম্বিৎ ফেরেনি। পেট্রোপণ্যসহ নিত্যপ্রয়ো- জনীয় দ্রব্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, জি এস টি ও নোটবাতিলের বোঝা, প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাপক বেসরকারীকরণের উদ্যোগ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত দেশের মানুষের কষ্টার্জিত আমানতের অবাধ লুটের ব্যবস্থা প্রভৃতিতো রয়েছেই। তার সাথে যুক্ত হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারহীন করার জন্য মালিক স্বার্থে শ্রম আইন সংস্কারের প্রক্রিয়া। যার সর্বশেষ নিদর্শন হল 'ফিক্সড্-টার্ম এমপ্লয়মেন্ট'। আগামী জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য ধর্মঘটের বাড়তি শক্তি হল, এই সময় দেশব্যাপী গড়ে ওঠা দুর্বার কৃষক আন্দোলন। ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষি ঋণ মকুব প্রভৃতি দাবি নিয়ে পথে নামছেন কৃষক সমাজ। শ্রমিক-কৃষক ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লীর বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রমিক-কৃষক সংঘর্ষ জাঠা। ঐদিনের তাক লাগানো জনসমাগমকে উপেক্ষা করতে পারেনি কর্পোরেট মিডিয়াও। ফলে শুধু সফল ধর্মঘট নয়, রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তনের মঞ্চও গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

শ্রমজীবীদের ঐক্য যখন দৃঢ়তর হয়, তখন সেই ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য, ভাঙ্গার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে শাসকশ্রেণী। এদেশে সেই প্রক্রিয়ার নাম সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। তাই আসন্ন ধর্মঘটের অন্যতম আহ্বান ধর্ম-জাত-ভাষা নির্বিশেষে শ্রমজীবীদের অটুট ঐক্য।

কেন্দ্রীয় কনভেনশনের অব্যবহিত পরেই, গত ৯ অক্টোবর এরাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে কনভেনশন। এই কনভেনশন থেকে কেন্দ্রীয় নীতির পাশাপাশি রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকেও ধর্মঘটের দাবি সনদে যুক্ত করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য কনভেনশনে অন্যতম অংশগ্রহণকারী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাই ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯-এর ধর্মঘটকে সফল করতে আমরাও দায়বদ্ধ। কেন্দ্রীয় নীতির কুফলে আমরাও আক্রান্ত। পাশাপাশি আমাদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন ধর্মঘটের অধিকার সহ বিভিন্ন ধরনের অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে রাজ্য সরকারও। স্বভাবতই আসন্ন ধর্মঘট আমাদের মরণ-বাঁচন লড়াই। সেই লক্ষ্যেই এখন থেকে শুরু হোক প্রস্তুতি দপ্তরে দপ্তরে। □

মোদী সরকারের 'আচ্ছে দিন'

প্রচারের ধামাকা ও বাস্তবতা

মোদী সরকারের চার বছর সাত মাস সময়ের শাসনকালে বহু নিত্য নতুন প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পকেই যুগান্তকারী বলে প্রচার করা হয়েছে। এমনিই কয়েকটি প্রকল্প হলো— প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, মুদ্রালোন এবং স্কিল ইন্ডিয়া। কিন্তু প্রচার যাই করা হোক না কেন, বাস্তবে প্রতিটি প্রকল্পই অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, সঠিক পরিকল্পনার অভাব ইত্যাদি কারণে ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। এক কথায় এগুলিও মোদী সরকারের ব্যর্থতার মুকুটে অতিরিক্ত কয়েকটি পালক যুক্ত করেছে মাত্র।

প্রধানমন্ত্রীর উজ্জ্বলা যোজনা ঃ এই প্রকল্পটিতে গ্রামীণ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই ৩.৫ কোটি পরিবারের কাছে এই সংযোগ পৌঁছে দেয়ার সাফল্য দাবি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি? প্রতিটি পরিবারে গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস কোম্পানিগুলিকে পরিবারপিছু ১৬০০ টাকা বরাদ্দ করেছিল। পাশাপাশি উপভোক্তা পরিবারগুলিকে ১৫০০ টাকা করে দিতে বলা হয়েছিল ওভেন এবং গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য। এও বলা হয়েছিল, কোনো পরিবারকে যদি একবারে এই টাকা দিতে অক্ষম হয়, তাহলে ৪ বা ৫ কিস্তিতে এই টাকা পরিশোধ করার সুযোগ থাকবে। যা সরকার ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের দামের সাথে যুক্ত করে নেবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গ্যাস পরিষেবা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বলে যে প্রচার করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। শুধুমাত্র গ্যাস সংযোগটি বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। ওভেন এবং সিলিন্ডারের জন্য দাম প্রতিটি পরিবারকেই দিতে হচ্ছে।

৮৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার কিস্তিতে ওভেন এবং সিলিন্ডারের দাম দেওয়ার সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কিছুদিন পরেই অধিকাংশ পরিবারই সিলিন্ডার পিছু দাম পরিশোধ করতে না পেরে গ্যাস ব্যবহার করাই বন্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ ৩.৫ কোটি পরিবারে বিনামূল্যে গ্যাসের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দাবিটি ভ্রান্ত।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা ঃ এই প্রকল্পে সমস্ত ভারতবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খুলে দেবার সিদ্ধান্তটিকে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বহু মানুষের 'জিরো ব্যালেন্স এ্যাকাউন্ট' খোলা হয়েছে যাদের একটা বড় অংশেরই নিজস্ব এ্যাকাউন্ট আগে থেকেই ছিল। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে যতগুলি এ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল তার ৪৮ শতাংশই খোলার পর থেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে। ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, মোট এ্যাকাউন্টের ১৭ শতাংশ জিরো ব্যালেন্স হিসেবেই রয়ে গেছে। এই ধরনের সমস্ত এ্যাকাউন্টে গড় জমার পরিমাণ মাত্র ২,৫০০ টাকা। শুধুমাত্র নোট বাতিল পর্বে প্রচুর কালো টাকা এই সমস্ত এ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল। কিন্তু তারজন্য কোনো তদন্ত হয়নি। এই প্রকল্পে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল— (১) ওভার ড্রাফটের সুযোগ এবং (২) বীমা। কিন্তু ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মাত্র এক শতাংশ এ্যাকাউন্ট হোল্ডার ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ওভার ড্রাফটের সুযোগ নিয়েছে এবং জীবন বীমার টাকা পেয়েছেন এমন উপভোক্তার সংখ্যা মাত্র ৪,৫০০। স্বভাবতই এই প্রকল্পটি ঢক্কানিনাদ ব্যতীত আর কিছুই দিতে পারেনি।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান ঃ এই প্রকল্পটির সাথে গান্ধীজীর নাম যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছিল, ২০১৯-র ২ অক্টোবরের মধ্যে গোটা দেশকে প্রকাশ্যে মলত্যাগ করার প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ৮টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই কাজ সম্পূর্ণ করেছে বলে দাবি করেছে। যদিও বিভিন্ন প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে বলা যায়, এ ধরনের দাবি সত্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য গুজরাট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১৪০০ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

এই ধরনের হাতে করে বিষ্ঠা পরিষ্কার করার কাজ করেন যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই দলিত সম্প্রদায়ের। শুধুমাত্র ২০১৭ সালে আইনত নিষিদ্ধ এই কাজে ৩০০ জন মানুষের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। এ ধরনের অমানবিক পেশা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটকে বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ২০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকের প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মন্তব্য করেছিলেন, হাতে করে বিষ্ঠা পরিষ্কার করার কাজের মধ্যে একধরনের ঐশ্বরিক অনুভূতি রয়েছে। তিনি আরো বলেছিলেন, এঁদের পূর্বপুরুষরা স্বেচ্ছায় এই ধরনের কাজ বেছে নিয়েছিল। গত আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল যে, যে সমস্ত গ্রাম নিজেদের স্বচ্ছ বলে দাবী করেছে, প্রকৃত মাপকাঠিতে তাদের স্বচ্ছতার শংসাপত্র দেওয়া যায় না।

মুদ্রা লোন ঃ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রালোন যোজনা আরো একটি প্রকল্প যা বাস্তবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দাবি করা হয়েছিল, এই প্রকল্পের ফলে স্বনিযুক্তির আগ্রহ বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, কোনোরকম সতর্কতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই ঋণ বণ্টনের জন্য। ঋণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল মাথাপিছু ১০ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ সালে এই প্রকল্প শুরু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত মোট ৯.৯ কোটি মানুষকে ৪.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ বন্টন করা হয়েছে। যার অর্থ মাথাপিছু প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ মাত্র ৪৭,২৪৯ টাকা। স্বভাবতই এই সামান্য অর্থে কোনো কার্যকরী ব্যবসা শুরু করা সম্ভব নয়। একমাত্র ফুটপাথে বসে পকোড়া ভাজা যেতে পারে। এটা উপলব্ধি করেই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী বেকার যুবক-যুবতীদের রোজগারের জন্য পকোড়া ভাজার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই প্রকল্পের সাথে দুর্নীতির বিষয়টিও যুক্ত হয়ে পড়েছে। একটি সরকারী ব্যাঙ্কের এক কর্তা কোনো ধরনের অনুসন্ধান না করেই ২৬ জনকে ৬২ লক্ষ টাকা ঋণ অনুমোদন করেছিলেন। সি বি আইয়ের হাতে ধরা পড়েছেন সেই ব্যাঙ্ক কর্তা। বাস্তবে এই মুদ্রা লোনের মাধ্যমে বি জে পি নিজের ক্যাডারবাহিনীর হাত শক্ত করতে চেয়েছে। □

কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা

২০১১ সালে রাজ্যের সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার বঞ্চনা শুরু করেছে। এই বঞ্চনার দুটি দিক রয়েছে— (১) সময়মতো মহার্ঘভাতা মিটিয়ে না দেওয়া এবং (২) কেন্দ্রীয় হারকে অনুসরণ না করা। কার্যত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার যে বিজ্ঞানসম্মত দাবি তাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। বর্তমানে বকেয়া ৫৬ শতাংশ মহার্ঘভাতার কেন্দ্রীয় হারগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখানো হলো। কর্মচারী বন্ধুদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য

বকেয়া মহার্ঘভাতা ঃ ১.৭.১৪—৭ শতাংশ। ১.১.১৫—৬ শতাংশ। ১.৭.১৫—৬ শতাংশ। ১.১.১৬—৬ শতাংশ। ১.৭.১৬— কেন্দ্র-২ শতাংশ (রাজ্য ৭ শতাংশ)। ১.১.১৭— কেন্দ্র-২ শতাংশ (রাজ্য ৭ শতাংশ)। ১.৭.১৭— কেন্দ্র-১ শতাংশ (রাজ্য ৩ শতাংশ)। ১.১.১৮— কেন্দ্র-২ শতাংশ (রাজ্য ৭ শতাংশ)। ১.৭.১৮— কেন্দ্র-২ শতাংশ (রাজ্য ৭ শতাংশ)।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার ওপর ও মহিলা সেশনে দুদিন ধরে ৫জন মহিলাসহ ২৪ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাসহ আগামী ধর্মঘটের ব্যাপক সাফল্যের শপথ নেওয়া হয় এবং জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক শ্রীকুমার। এরপর সদস্যদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কর্ণাটক সংগঠনের সভাপতি মহাদেরয়া সাথাপাটি। পরে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে এস লাম্বা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দুদিনের সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

(১) আগামী ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে হবে। (২) দুদিনের ধর্মঘট সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী নিতে হবে। সর্বভারতীয় ১২ দফা দাবির সাথে এন পি এস ও চুক্তি কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতনের দাবি যুক্ত হবে। (৩) সর্বত্র প্রচারের জন্য পোস্টার, লিফলেট, হোর্ডিং সহ স্কোয়াড, মিছিল করতে হবে, এছাড়া সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে প্রচারে অংশগ্রহণ করতে হবে। (৪) ২০ ডিসেম্বর, ২০১৮ "নোটিশ প্রদান দিবস" সব রাজ্যে করতে হবে। (৫) জাতীয় মহিলা কনভেনশন আগামী ২৯-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ মাহারাষ্ট্রে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে। (৬) দিল্লী হেড কোয়ার্টার্স বিল্ডিং আগামী ৩ মাসের মধ্যে ক্রয় করা হবে এবং চেয়ারম্যান এস লাম্বাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। (৭) সংগঠনের সদস্য চাঁদা, সংগঠন তহবিল ও এমপ্লয়িজ ফোরামের বকেয়া দ্রুত জমা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 7th Issue, November 2018

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

মেহনতীদের ধ্রুবতারা নভেম্বর বিপ্লব

অশোক রায়

'নভেম্বর বিপ্লব' শব্দবন্ধটি উচ্চারণের সাথে সাথে ভূত দেখার মতো আতঙ্ক গ্রাস করে ধনবান উচ্চকোটির মনে, আর উন্মাদনার তরঙ্গ খেলে যায় অগণিত মেহনতী শ্রমবানের সর্বাঙ্গ জুড়ে। 'নভেম্বর বিপ্লব' আতঙ্কিত ধনবানদের নয়া নয়া চক্রান্ত রচনায় প্ররোচিত করে আর শ্রমবানদের উদ্বুদ্ধ করে নতুন নতুন কর্মউন্মাদনার সরণী রচনায়। অন্ধকারের জীবেরা হিংসার বিষবাষ্প ছড়ায় বিপ্লবের আতঙ্কে, আর আলোর পথযাত্রিরা প্রেমের নির্মল বাতাস বয়ে আনে মানব সমাজে। নতুন সকাল রচনার কাজে হাত লাগায় মেহনতীরা আর শ্রমচোরেরা চোরাকক্ষে বসে সেই শ্রমসম্পদ লুঠের ছক কষে চলে। অবিরাম এই হিংসা আর দ্বেষের সাথে পাল্লা দিয়েই জেগে থাকে মানবতা, জাগিয়ে তোলে মানবিক বোধ, আগামীর শিশুর জন্য রেখে যেতে চায় একমুঠো জীবন্ত সকাল। আসলে সাহিত্য করার বাসনা নিয়ে এই নিবন্ধের অবতারণা নয় তবে একজন মেহনতীর মনের আগুনের দু-একটা ফুলকি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষ করে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন একদিকে লোভের কুৎসিত রূপ আর হিংস্রতায় উন্মাদ কিছু দুর্বৃত্তের আস্ফালন গোটা সমাজটায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তখন সেই আস্ফালনের গর্জনকে ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মেহনতী রাজপথের দখল নিয়ে পাল্টা হুঙ্কার দেওয়ার ঘটনাও আমাদের মনেপ্রাণে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে আনছে। বর্তমান সময় তাই একদিকে চরম আঘাতের মোকাবিলা করছে করে চলেছে প্রতিনিয়ত একইসাথে নতুন দিনের স্বপ্নবোনার কাজ করে চলেছে—শিক্ষায়তনে ছাত্র সমাজ, মাঠে-ময়দানে যুব-মহিলা-মেহনতীর কলতান ক্রমে একসূত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; আর ঠিক এমনই সময়ে কার্যত দিশেহারা ধনবানরা তাদের লুটের মাল নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্লান্তিকর অর্থের তড়পানি, চরম নোংরামির কার্নিভাল, আত্মপ্রচারের বিরামহীন স্রোতের বিপরীতে তাই আমাদের কাছে মরূদ্যানের মতো হাজির 'নভেম্বর বিপ্লব'। আমাদের ভাল, মন্দ, সত্য-অসত্য, শুভ-অশুভ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বোধগুলোকে যখন কার্যত গুলিয়ে দেওয়ার সর্বগ্রাসী প্রয়াস চলছে, তখন নিজেদের স্থির রাখা, বিশ্বাসের কঠিন ব্রতে নিজেদের ব্রতী রাখার জন্যই আমাদের 'নভেম্বর বিপ্লবের' চর্চা প্রতিনিয়ত প্রয়োজন। নিজেদের জাগিয়ে রাখার জন্য আর অগণিত মেহনতীদের জাগানোর জন্যও।

'বিপ্লব' কথাটার মধ্যেই একটা রোমান্টিকতা আছে; তাই সেই রোমান্টিকতাকে ব্যবসায়িক ভাবে ব্যবহার করার জন্য শোষকেরা অবিরাম নতুন নতুন মোড়কে তাকে ব্যবহার করে চলেছে। বহু ব্যবহার আর ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের স্রোতে ''বিপ্লব'' শব্দটারই 'ক্লিশে' হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। হারিয়ে যেতে বসেছে তার আসল মর্মার্থ। সহস্রাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদের প্রায় পৌনে দুশো বছর আগের একটা মৌলিক চিন্তা তিনি 'দর্শনের দারিদ্র' নামক গ্রন্থেই তার সূত্রায়ন করেন যা আজও প্রাসঙ্গিক এবং আরও বেশি উজ্জ্বলতা নিয়ে হাজির। তিনি বলছেন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় **'আমরাই হচ্ছি সেই বিপর্যয়কর অর্থনীতিবিদ (Fatalist Economist) যারা বুর্জোয়াদের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে বলছি যে, সর্বহারারা যারা তোমাদের সম্পদ সংগ্রহে (accuring wealth) সাহায্য করছে তাদের বঞ্চনা বন্ধ কর।'** তিনি আরও লিখছেন যে, এই বিপর্যয়কারী প্রতিষ্ঠান (fatalist school) দুইভাগে বিরাজ করছে একটা হলো চিরায়ত (classic) আর একটা হলো রোমন্টিক (Romantic)। চিরায়তরা চাইছেন সর্বহারাশ্রেণীকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে রাখতে, আর রোমান্টিকরা সর্বহারাশ্রেণীকেই এই লড়াইয়ের নায়ক হিসাবে হাজির করছে। চিরায়তরা সর্বহারাকে ভদ্র (sober), কঠোর পরিশ্রমী, আর কম সন্তান উৎপাদনের পরামর্শ দেয়। ... বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তন হলো মানবতাবাদি বিদ্যায়তন, যা বৈপরিত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে, সমস্ত মানুষকে বুর্জোয়ায় পরিবর্তিত করতে চায়, আর এটা বোঝাতে চায় যে তত্ত্বের অভ্যাস সময়ের দ্বন্দ্ব থেকে বহু দূরে। তাই তত্ত্বের অভ্যাস থেকে সবসময় দূরে রাখতে তৎপর। ... আর রোমান্টিকরা চায় ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ সর্বহারারা তাদের নিজের শক্তিকে চিনুক, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক। ... বুর্জোয়াদের যেমন জ্ঞান তাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্ব করে তাদের অর্থনীতিবিদরা, তেমনিই সর্বহারাদের তাত্ত্বিক প্রতিনিধি হলো সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টরা ...'। আমরা একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম এইজন্য যে রোমান্টিকতা ছাড়া, বিপ্লবের স্বপ্ন ছাড়া, বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ বোঝা সম্ভব নয়; তাকে অনুভব করার আগ্রহতো দূর অস্ত্। তাই 'নভেম্বর বিপ্লব' নিয়ে আমাদের রোমান্টিক থাকার লক্ষ্যেই হোক দৈনন্দিন পথচলা।

১০১ বছর আগে ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর ১৯১৭ যে দুনিয়া কাঁপানো দশদিনে গোটা দুনিয়াটা থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সেটা আপনা আপনি হয়নি। গোটা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিতে হয়েছিল। বিপ্লব হয় না— বিপ্লব করতে হয়— এই অমোঘ সত্যটা আজকের দিনে বারবার স্মরণ করা প্রয়োজন আর প্রয়োজন তার থেকে শিক্ষা নেওয়ার, আস্থায় বলীয়ান হওয়ার, নতুন সমাজ যে সম্ভব এবং সেটা এই জরাজীর্ণ পৃথিবীতেই সম্ভব— এই প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকা। সেই লক্ষ্যেই 'নভেম্বর বিপ্লবের' আগে যে বাস্তব অবস্থাটা ছিল এবং বিপ্লবের পর তার কতটা দ্রুত এবং কতটা বিশাল পরিবর্তন সাধিত হলো সেই দিকটুকুই এই নিবন্ধে সংক্ষেপে রাখার চেষ্টা করছি। আজকের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'টাকা'র সর্বজনীনতার যে দৃষ্টিকটু প্রকাশ আমরা দেখছি, আজ থেকে দুশো বছর, তিনশো বছর আগেই তার যে বর্ণনা আমরা শেক্সপিয়ারের নাটক 'টিমন অব এথেনস'-এর উদ্ধৃতি যা মার্কস তার ক্যাপিট্যাল গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন সেটার একটু পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, ''সোনা! হলদে, ঝকঝকে, মহামূল্য সোনা ... এর এই একমুঠো, কালোকে সাদা করবে, কুৎসিৎকে করবে সুন্দর, অন্যায়কে ন্যায়, নীচকে অভিজাত বৃদ্ধকে যুবক, কাপুরুষকে বীর। ... এই হলুদে ক্রীতদাস ধর্মে ধর্মে রাখীবন্ধন করতে পারে, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে, অভিশপ্তকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাইয়ে দিতে পারে, ... চোরদের ওপর উপাধি, সম্মানও রাজ-অনুমোদন আরোপ করে তাদের নিয়ে বসাতে পারে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পাশে''— আমরা বর্তমানে শুধু এইটুকু বদলাতেই পারি যে 'রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পাশে' বদলে— 'রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপেই'। বর্তমান সময়ের ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের প্রতি একঝলক দৃষ্টি ঘোরালে এই সত্যটাই লক্ষ্য করবো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৯১৭ সালের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালির মিলিত ক্ষতির থেকেও রাশিয়ার ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। রাশিয়াতেই মারা যায় ২৭.৬২ লক্ষ, আহত প্রায় ৫০ লক্ষ আর নিরুদ্দেশ ২৫ লক্ষ মানুষ। রুশ বাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসঘাতক সমরসচিব, আর তাদের পরামর্শদাতা রাসপুটিন। জারের রাজসভা জার্মান গুপ্তচরে ভর্তি থাকতো। আর বড় বড় কোম্পানীগুলিই সে দেশের শিল্প কারখানা সহ সমস্ত অর্থনীতিটাই নিয়ন্ত্রণ করতো। তৈলক্ষেত্রে— দি রয়াল ডাচ শেল অয়েল কোম্পানি, দি নর্থ ককেসিয়ান অয়েল ফিল্ডস, দি নিউ শিবারেফ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ইত্যাদি, অস্ত্র নির্মাণ শিল্পে ব্রিটিশ ও ফরাসি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে স্লাইদার ক্রস্ট ইত্যাদিরা নিয়ন্ত্রণ করতো, ব্রিটেন আর ফ্রান্সের বড় বড় ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান দি হোরস, বেয়ারিং ব্রাদার্স, সোভিয়েট জেনেরাল, রথ চাইল্ড ইত্যাদিরা সমগ্র আর্থিক দিক নিয়ন্ত্রণ করতো ফলে জারের আমলে রাশিয়া প্রকৃত পক্ষে পশ্চাদপদ শিল্পউৎপাদন সম্পন্ন পরনির্ভরশীল, ক্ষুধা, অশিক্ষা, ধর্মান্ধতাক্লিষ্ট একটা দেশ হিসাবে বিরাজ করছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের কৃপাপ্রার্থী দুর্বল শিল্পভিত্তির দেশটার ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তুলে কিভাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটা দেশ শক্তিশালী সমরশক্তি এবং শিল্পশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠল আর কাহিনী এখানে ব্যাখার প্রয়োজন নেই। নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে তার বহুদিক আমরা জেনেছি তাই পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে দিকটা অবশ্যই উল্লেখ করার তা হলো এই 'নভেম্বর বিপ্লব'কে ধ্বংস করার জন্য বৃহৎ শক্তির দেশগুলির যে একদিনও সময় নষ্ট করেনি এবং তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগেও পিছপা হয়নি তার দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। সোভিয়েত বিরোধী সেই অভিযানে সবথেকে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ব্রিটিশ ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি 'রয়াল ডাচ শেল'-এর সর্বেসর্বা হেনরি উইলহোল অগাস্ট ডেটারডিং। ঠিক যেমনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কিন ফোর্ড কোম্পানির হেনরি ফোর্ড।

'নভেম্বর বিপ্লবকে' উৎখাত করতে ১৪টি রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা না করেও রাশিয়াকে আক্রমণ করে যথা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া, সার্বিয়া, চীন, ফিনল্যান্ড, গ্রীস, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক-এর সাথে যুক্ত হয় জারের আমলের সেনাপতিদের অধীন হোয়াইট গার্ডস। ভিতরের আর বাইরের এত বিপুল আক্রমণ মোকাবিলা করে বিপ্লবী জনগণ তাদের অদম্য মনোবল আর মতাদর্শের জোরে। অস্ত্রের জোরের থেকে আদর্শের জোর যে অনেক বেশি সেই চরম সত্যটাকে ''নভেম্বর বিপ্লব'' প্রমাণ করেছে। এরপর বিপ্লবকে ধ্বংস করার যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং লেনিন সহ সমগ্র বিপ্লবের নেতাদের খুন করার বহু চক্রান্তের কথা দু'জন মার্কিন সাংবাদিক মাইকেল সেয়ার্স এবং এলবার্ট কাহনের--- 'সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত' বইটির প্রতি ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন। (উৎসাহী পাঠক একবার দেখে নিতে পারেন)।

কিন্তু ঠিক কোন মন্ত্রবলে বৈপ্লবিক শক্তি জয়ী হলো সেটা বুঝতে গেলে একটু গোড়ায় যাওয়া দরকার। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া শান্তি চুক্তি, জমির উপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, উৎপাদনের শক্তির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ঘোষণা করে, আর সমস্ত মানুষের দায় রাষ্ট্রের— এই ঘোষণার মাধ্যমেই গোটা সমাজে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায়। কারণ এসব কথা এর আগে তারা শোনেনি। এবং মানুষের এই মরিয়া শক্তিতে ভর করেই উৎপাদিকা শক্তি যা কার্যত চাপা পড়েছিল তা উন্মুক্ত হয় আর পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে বিপ্লবের রাষ্ট্রনায়করা তাকে মানবজাতির কল্যাণে বাহিত করেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা এই প্রথম ব্যক্তিস্বার্থের বদলে সামাজিক স্বার্থে পরিচালিত হলো। ফলে উৎপাদিকা শক্তি রুদ্ধদ্বার ভেঙ্গে চরম উৎকর্ষতার দিকে ধাবিত হলো। অতিদ্রুত এই সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রত্যক্ষ করে কয়েকটি দেশের জনগণ উৎসাহিত হয় ৪ বছরের মধ্যে ১৯২২ সালেই বেলারুশ, ককেশিয়া ও ইউক্রেনের সাথে রাষ্ট্রগোষ্ঠী গঠন সম্ভব করে তোলে। যার নাম ইউ এস এস আর।

আজকের দিনে শিক্ষা নেওয়ার বিষয় 'নভেম্বর বিপ্লব' থেকে যা পায় তা হলো— (১) চরম বৈষম্যের কেন্দ্রে মুষ্টিমেয় ১ শতাংশ মানুষের হাতে যে সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে— সেটা উদ্ধার করা এবং তাকে সামাজিক মালিকানায় পরিণত করা প্রয়োজন। (২) উৎপাদিকা শক্তি কতিপয় ব্যক্তির হাতে পড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বন্ধ্যা করে ফেলার বিরুদ্ধে তাকে মুক্ত করা এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। (৩) মানুষকে মানুষ বলে সমস্ত সামাজিক মর্যাদা দেওয়া এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করে আগামী প্রজন্মের জন্য একটা নির্মল সুন্দর পৃথিবীকে নির্মাণ করা প্রয়োজন। 'নভেম্বর বিপ্লব' এই শিক্ষাই শুধু দেয় না, একই সাথে বাতলে দেয় এই লক্ষ্যকে অর্জন করার সংগ্রামী পথকেও। সেই পথের পথিক হয়েই পৃথিবীর বুকে 'নভেম্বর বিপ্লবের' মতো বিপ্লবের পতাকা বহন করে চলবে মেহনতী সংখ্যাগরিষ্ঠরা।

'নভেম্বর বিপ্লব' গোটা বিশ্বের মেহনতী মানুষের বৌদ্ধিক ধ্রুবতারার মতো দীপ্যমান। বিপ্লবের সময়ের দিনগুলিতে রাশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীরা যে প্রতিক্রিয়াশীলদের হয়ে বিপ্লবী শক্তিকে বাধা দিয়েছিলেন সেটা 'জন রীডের' 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন' বইটির ছত্রে ছত্রে আমরা জানতে পারি। সরকারী কর্মচারীরা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা থেকে বর্তমান বিশ্বে প্রায় সমস্ত দেশেই একটা প্রগতিশীল ভূমিকায় আস্থাশীল হয়েছেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত বিপর্যয়ের সাময়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে বর্তমান নয়াউদার নীতির যুগে দাড়িয়ে সরকারী কর্মচারীরা যে প্রগতির পথ রচনায় সহযোগী শক্তি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন, সেই বৌদ্ধিক স্তরের উন্নয়ন মহান 'নভেম্বর বিপ্লবের' এক অন্যতম শিক্ষাও বটে। বিপ্লব সমাধা করার পর সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিয়ে যে বিপুল প্রকাশনার ব্যবস্থা নয়া বৈপ্লবিক সরকার করছিল তা আজও গোটা বিশ্বের কাছেই শিক্ষণীয়। প্রায় সবকটি ভাষায় মৌলিক সাহিত্য এবং দর্শনের রচনা সুলভ এবং সুন্দরভাবে গোটা বিশ্বের মেহনতীর কাছে পৌঁছানোর কাজটা যদি 'নভেম্বর বিপ্লবের' পর না হতো তাহলে বিশ্বটা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে থাকতো, পিছিয়ে যেতো বহু দেশের স্বাধীনতার লড়াইও। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার তীব্র গণজাগরণ সৃষ্টিতে তাই 'নভেম্বর বিপ্লব' চিরনবীন, চিরকালীন পথপ্রদর্শক একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রসঙ্গত কিউবাতেও ১৯৫৬ সালে এই নভেম্বর (৩০ নভেম্বর) মাসেই বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিজয় অর্জিত হয়। আবার এই নভেম্বর মাসেই হিংস্র শোষকেরা ১৯৬২ সালে এই রাজ্যের বিধানসভায় ১৬ নভেম্বর বাম নিষেধাজ্ঞার বিল আনে, ২০০৬ সালে ৩০ নভেম্বর বিধানসভায় ভাঙচুর করা আজকের শাসকেরা এই ২০১৮ সালের ২৯ নভেম্বর তার কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করেছে— সবই নভেম্বর বিপ্লবের আতঙ্কেই। উভয় বিপ্লবই গোটা বিশ্বে তাদের চেতনাকে প্রসারিত করার আন্তর্জাতিক যে উদ্যোগ নিয়েছিল আজকের দিন তেমন উদ্যোগের একটা অভাব আমাদের অবশ্যই ভাবনার বিষয় এবং এই দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে আরও সচেতনভাবে মেধার সাহায্যে ব্যবহার করার দায় 'নভেম্বর বিপ্লবের' থেকেই শিক্ষা নেওয়া দরকার এবং আমরাও তা নেব। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।